বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ

সুকুমারী ভট্টাচার্য

গা ঙ চি ল

সূচি

বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ

প্রাক্‌কথন

অন্নাভাব প্রাচীনকালে পৃথিবীর সব দেশেই ছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের গ্রিসে হেসিয়ডের 'ওয়র্কস অ্যান্ড ডেজ' বইতে পড়ি, 'যে ব্যক্তির বাড়িতে যথাকালে এক বছরের খাদ্য সঞ্চিত হয়নি— ভূমিতে জন্মায় যে ফসল, শস্যলক্ষ্মীর দানা সেই খাদ্য— সেই লোকের কোর্ট কাছারির বিবাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই।'[১] অর্থাৎ সমাজে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হল খাদ্য সঞ্চয়। এ রকম বিত্তবান সমাজে মুষ্টিমেয়ই ছিল, গ্রিসে শুধু নয়, সর্বত্রই। সঞ্চয়ের উপদেশ দিচ্ছেন হেসিয়ড, সঞ্চয় ক্ষুধাকে ঠেকায়।[২] সঞ্চয়ের প্রাকশর্ত হল প্রাচুর্য এবং উদ্বৃত্ত এবং সেটা জনসাধারণের ভাগ্যে কখনওই ঘটত না। তারা সারা পৃথিবীতে চিরকালই 'দিন আনি দিন খাই'-এর শেকলে বাঁধা। প্রাচীন মিশর, চিন কোথাওই চাষি-মজুর সারা বছর পেট ভরা খাবার পেত না। ভারতবর্ষও ব্যতিক্রমী নয়; দারিদ্র্যে, অভাবে, ক্ষুধায় অন্য সব দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষেরও বৃহৎ জনগোষ্ঠী এক সারিতেই ছিল। পার্থক্য একটাই: আমরা বলে থাকি, প্রাচীনকালের মানুষ প্রাচুর্যে লালিত ছিল। দেশটা ছিল সুজলা সুফলা। এমনকী রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য / দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন'। কখনও কখনও ভারতবর্ষ থেকে খাদ্যপণ্য বিদেশে গেছে এ কথা যেমন সত্য তারই সঙ্গে এ-ও সত্য, সে রপ্তানি সম্ভব হয়েছে দেশের বহু লোককে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করে। ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিও করেছে। বৈদিক আর্যরা সর্বতোভাবে তৃপ্ত ছিল এমন একটা রূপকথা প্রায়ই প্রচারিত হয়। এক ধরনের ইতিহাস বইতে এবং গণমাধ্যমে এ ধরনের কল্পিত কথা প্রায়ই পরিবেশিত হয়। সেই রূপকথাটা যাচাই করতেই এ প্রবন্ধের সূত্রপাত।

ক্ষুধা ও খাদ্যের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান ছিল। এ কথা শুনতে যত অপ্রিয়ই হোক, মানতে যত অসুবিধেই হোক না কেন, বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি-সহযোগে সেই তথ্যগুলি এ বইতে সন্নিবেশিত হল। যে ধরনের নির্লজ্জ মিথ্যা, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস

১ 'Little concern has he with quarrels and courts who has not a year's victuals laid up betimes, even that which the earth bears.' Hessiod, *Works and Days*. pp. 30-32.

২ 'He who adds to what he has, will keep off brighteyed hunger.' *ibid* p 363

বলে ছড়ানো হয়েছে তারই কিছু প্রতিকার ঘটুক প্রকৃত তথ্য থেকে, এ বাসনা এই রচনার পিছনে কার্যকরী। বৈদিক যুগে অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পেত না, এটা তথ্য। বিজ্ঞান তখন খুবই পশ্চাৎপদ ছিল; শস্য উৎপাদনের কৃৎকৌশল ছিল অনুন্নত, শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না; প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি ঘটত; এ সবের জন্যে যে-অভাব তা ছিল সার্বত্রিক এবং তার মধ্যে গ্লানির কিছু নেই। আবার বৈদিক ইতিহাস অনুধাবন করতে করতে দেখি, আর্যরা আসার চার পাঁচ শতাব্দীর মধ্যেই উৎপাদন ব্যবস্থায় কৌশলগত প্রকরণে বিপ্লব এসে যাওয়ায় উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রয়োজনকে ছাপিয়ে কিছু উদ্বৃত্তও থাকছে। কিন্তু ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে শ্রেণিবিভাগও দেখা দিয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে। তারা তা নিরন্ন মানুষের মধ্যে বণ্টন না করে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করল স্বদেশে ও বিদেশে। ফলে নিচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন কোনও দিনই মিলল না।

উপনিষদের যুগে দেখা দিল জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব এবং তার কিছু পরে কর্মবাদ। কাজেই খেটেখাওয়া মানুষের অর্ধাহার-অনাহারের পুরো ব্যাখ্যা মিলল: মানুষ যেহেতু মৃত্যুর পরে বারে বারে জন্মায়, তাই এ জন্মের এই যে অন্নাভাব এ তার পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিরই ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিটা এ জন্মের অগোচরে, এ জন্মের সুকৃতি দিয়ে তার প্রতিকার ঘটবে যে পরজন্মে, সে-ও তার অগোচরে। ফলে মেনে নেওয়া ছাড়া এবং সমাজের কর্তাব্যক্তিদের শ্রীচরণ সেবা করা ছাড়া অভুক্ত দরিদ্রের আর করবার কিছুই রইল না। কাজেই দুঃখ দারিদ্র্য যথাপূর্বম রইল, ব্যাখ্যা রইল, আর রইল নিষ্প্রতিকার ক্ষুধা।

ব্যাখ্যা-দুর্ব্যাখ্যা দিল শাস্ত্র এবং তার প্রবক্তা ও পুরোহিতরা। এরা নিজেরা উৎপাদনকর্ম থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেয়ে বাকি সমাজের ওপরে পরগাছার মতো থেকে খাদ্যের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছিল। এই উৎপাদক-অনুৎপাদক বিভাজন বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। পুরোহিতদের উৎপাদন করতে হত না, যজ্ঞের ক্রিয়াকর্মই তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত কর্ম, বাকি সময়ে তার বিনিময়ে তারা বরাদ্দ খাদ্যে অধিকারী ছিল। শ্রমকে যখন কায়িক ও মানসিক হিসেবে দু'ভাগ করা হল, তখন থেকে পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে কায়িকশ্রমী বুদ্ধিজীবীর চেয়ে নিচের স্তরের জীব বলে পরিগণিত হতে লাগল। সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেল শাস্ত্রকার ও পুরোহিতদের হাতে। যেহেতু মূলত ক্ষত্রিয় রাজারাই তখনও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাই ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সাহিত্যে ক্ষমতার জন্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের একটা রেষারেষি চোখে পড়ে।

সংহিতা-ব্রাহ্মণে অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডে খাদ্যের জন্যে সরাসরি প্রার্থনা অসংখ্য; সমস্ত দেবতার কাছে, সব ঋষিবংশের সূক্তকাররাই খাদ্যের জন্যে করুণ আর্তি নিবেদন করেছেন। তার মধ্যে ক্ষুধার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা দুই-ই ধরা পড়ে। যজ্ঞ করা হত খাদ্যলাভের জন্যে, অন্যান্য ঐহিক সুখের জন্যেও, কিন্তু খাদ্য ছিল একটি মুখ্য কাম্যবস্তু। ক্ষুধা সম্পর্কে আতঙ্ক বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে অশনায়াপিপাসে, ক্ষুধাতৃষ্ণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আবেদনে। অশনায়াপিপাসার অপর নাম মৃত্যু, এর থেকেই ক্ষুধা সম্পর্কে আতঙ্ক স্পষ্ট

বোঝা যায়। যজ্ঞ দিয়ে, দেবতার স্তব দিয়ে, তীব্র প্রার্থনা দিয়ে ক্ষুধাজনিত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা দেখতে পাই।

আরণ্যক-উপনিষদে অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে কি ছবিটা পালটে গেল? তখন তো লোহার লাঙলের ফলা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, স্বল্পতর শ্রমে বেশি জমি চাষ করা যাচ্ছে, ফসল ফলছে বেশি। ক্ষুধার প্রকোপ কি তখন কমল কিছু? এ যুগে মুখ্য কথাটা যজ্ঞ নয়, ব্রহ্মজ্ঞান। ধর্মচেতনায় জন্মান্তরবাদ এসে গেছে, এবং তারই সঙ্গে জন্মান্তরের পরম্পরা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে জ্ঞান দিয়ে নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করাই তখনকার ধর্মাচরণের প্রকৃষ্ট পথ। যেখানে এই সব তত্ত্বকথা সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে খাদ্যের জন্যে আকুলতা কি কমেছে কিছু?

আরণ্যক-উপনিষদ সাহিত্য ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। এখানেও ক্ষুধার অন্নের জন্যে একই রকম আগ্রহ এতটাই যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে ব্রহ্মের সঙ্গে অন্নকে বারে বারে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। নানা উপাখ্যানে ও সন্দর্ভে ক্ষুধার গুরুত্ব এবং অন্নের মহিমা ব্যক্ত করা হয়েছে। তার সংখ্যা ও পরিমাণ এত বেশি যে এ যুগেও নিরন্ন মানুষের সংখ্যা, সমাজে অন্নের ব্যাপক অভাব, ক্ষুধায় মৃত্যুর আতঙ্ক সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

তত্ত্ব আলোচনার যুগে মাঝেমাঝেই যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের সভায় এসে আলাপ করতেন। একবার তেমনই আসার পরে জনক প্রশ্ন করলেন, 'কী মনে করে ঠাকুর? ব্রহ্মতত্ত্বের জন্যে এলেন, না গাভীর জন্যেই?' 'দুইয়ের জন্যে, মহারাজ', নিঃসংকোচে বললেন যাজ্ঞবল্ক্য। অন্যত্রও পড়ি খাদ্যসংস্থান বা বৈভববৃদ্ধির জন্যে যাজ্ঞবল্ক্যের তৎপরতার কাহিনি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের যেমন সরাসরি জনকের সভায় খাতির ছিল বলে নিজের ইষ্টসিদ্ধিটা তিনি ঠিক মতো গুছিয়ে নিতে পারতেন, আপামর-জনসাধারণের তো সে সুবিধে ছিল না। রাজদ্বারে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাই অভাবের দিনে তাদের উপবাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন বিধান ছিল না যে, খরা-অজন্মার দুর্ভিক্ষে রাজকোষ উন্মুক্ত করে নিরন্ন মানুষের অন্ন জোগাতে হবে। নিশ্চয়ই অঞ্চলে কোনও কোনও রাজা বা ভূস্বামী তা করতেন, কিন্তু এমন বহু তথ্য পাওয়া যায় যখন ভিক্ষা সংগ্রহ করতে না পারলে মানুষকে উপবাস করতেই হত। মনে পড়ে:

> দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
> জাগিয়া উঠিল হাহা রবে,
> বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে
> শুধালেন জনেজনে,
> ক্ষুধিতের অন্নদানসেবা
> তোমরা লইবে বল কেবা।

রাষ্ট্রে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে বুদ্ধ তাঁর ভক্তদের সে দায়িত্ব নিতে বলতেন না।

পুরাকালে মানুষের অবস্থা ভাল ছিল, বেদের যুগে মানুষ বেশি ভাল খেতে, পরতে পেত এমন একটা কল্পকথা সমাজে চালু আছে; এ গ্রন্থে বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ নজিরে এ কল্পকথাটা যাচাই করতে গিয়ে ঠেকে গেছি। উত্তর-বৈদিক তত্ত্বের যুগেও যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর প্রস্থানের বড় বড় তত্ত্বের প্রবক্তা, তাঁরা ইহকাল, পরলোক, জন্মান্তর, কর্ম, কর্মফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে মানুষগুলো দিনভর খেটে তাঁদের অন্ন জুগিয়ে নিশ্চিন্ত রেখেছে, ওই সব তত্ত্ব আলোচনার অবকাশে সেই হতভাগ্যরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেল কিনা তা নিয়ে তাঁরা কেউই মাথা ঘামাননি। ফলে সমাজে ধর্মচর্চাও চলল, পাশাপাশি ক্ষুধার প্রকোপও রইল অব্যাহত। মনে পড়ে, গান্ধীজির একটি উক্তি,[৩] 'ক্ষুধিতের সামনে স্বয়ং ভগবানও খাদ্য ছাড়া অন্য চেহারায় আসতে সাহস পান না।' 'সাহস পান না' কথাটা প্রণিধানযোগ্য। ক্ষুধা এক তীব্র অভিজ্ঞতা, তার দাবিও তেমনই অপ্রতিরোধ্য। তার মুখোমুখি হতে গেলে কেবলমাত্র খাদ্যসংস্থান দিয়েই তা সম্ভব; নীতিকথা, ধর্মাচরণ, তত্ত্ব-উপদেশ সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। এই যে সরাসরি খাদ্য দিয়ে ক্ষুধার মোকাবিলা করা, তা বেদের যুগেও হয়নি, আজও হয়নি।

এই নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ। পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু 'গাঙচিল' কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত আমার রচনা সংকলনে অন্তর্ভুক্তি কালে যথাসম্ভব পরিমার্জন করার চেষ্টা হয়েছে। মূল্যায়নের ভার পাঠকের।

৩ 'Before the hungry even God dares not come except in the shape of bread.'

খাদ্যের প্রার্থনা

মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক— এই এক হাজার বছর সময়কালে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়। সম্ভবত ভারতের বাইরেই এর রচনা শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে সেই কাজ এ দেশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর প্রধান দুটো ভাগ: কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ও উপনিষদ। আমাদের আলোচনায় সংহিতা পর্বকেই বৈদিক সাহিত্যের পূর্বভাগ ধরে নেব, যদিও ব্রাহ্মণের অনেকগুলিই সেই যুগে রচনা হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের আলোচনা করব, কারণ বিষয়গতভাবে এ তিনটির সংযোগ অনেক বেশি।

আর্যরা ভারতবর্ষে একবারে আসেনি, দলে দলে, বারে বারে এসেছিল। তাদের মধ্যে একটি দলই বেদ বহন করে এনেছিল— সেটিই হয়তো ছিল শেষ বৃহৎ দল। তখনকার ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানাও খুব স্পষ্ট নয়, হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের দিকের অনেকটা অংশই ভারতবর্ষের সীমার মধ্যেই ছিল। আর্যরা ঠিক কবে কোথা থেকে আসে তাও খুব সুনিশ্চিত নয়।[১] তবে বর্তমান ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে একটি বৃহৎ ভূখণ্ডে যে ইন্দো-ইরানীয় ও ইন্দো-আর্য ভাষা কথিত হত, আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রামশরণ শর্মার মতে, 'দক্ষিণ পারস্য থেকে, আফগানিস্তান হয়ে বালুচিস্তান পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে এক প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। ইন্দো-পারসিক ও ইন্দো-আর্য ভাষাভাষী লোকেরা ২০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের পর এখানে বসতি স্থাপন করে।'[২]

প্রথম দিকে যে সব আর্য গোষ্ঠী খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে আসে তাদের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের কিছু সূক্ত বহন করে

---

১ Habib, Irfan & Faiz Habib, "The Historical Geography of India 1800-800 B C." in *Proceedings of the Indian History Congress*, 52nd section (ed), K M Srinali, Secy, Indian History Congress, New Delhi, 1991-92, pp. 72-97.

২ '...a vast area with a pre-Aryan population extended from South Iran through Afganistan to Baluchistan in which the speakers of the Indo-Iranian and the Indo-Aryan languages settled after 2000 B C' R S Sharma; *Looking for the Aryans*. Orient Longman, 1995, p 70.

শেষতম যে গোষ্ঠীটি ভারতবর্ষে এল তাদের বিষয়ে জানবার একমাত্র উৎস ঋগ্বেদ। মনে করা হয় যে, এরা যাযাবর পশুচারী ছিল। হয়তো-বা আরও দূর অতীতে এরা ইয়োরোপের কোনও অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে, কয়েক শতক পরিক্রমা করে, এখানে পৌঁছয়। তখন এদের মূল খাদ্য ছিল ফলমূল, গরু ছাগলের দুধ, ঘি, দই, ক্ষীর, ইত্যাদি, আর আগুনে-ঝলসানো পশুমাংস। যে সব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এরা আসে তাদের মধ্যে অনেকেই চাষ করতে জানত, ফসল থেকে তৈরি রুটিও সে অঞ্চলে এরা কখনও কখনও পেয়ে ও খেয়ে থাকবে। কিন্তু এরা নিজেরা চাষ করতে জানত না। যাযাবর অতীতে এরা যখন কোনও বিপদে পড়ে বা বিপদের আশঙ্কায় দেবতার শরণাপন্ন হত, অথবা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বা ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে কৃতজ্ঞতায় দেবতা শরণ নিত, তখন এরা খুব সংক্ষিপ্ত একটা যজ্ঞ করত। সম্ভবত দলেরই— প্রবীণতম বা প্রাজ্ঞতম— একজন একটা পরিষ্কার জমিতে একটা পশু বধ করত। সে নিজে বা আর কেউ কিছু মন্ত্র আবৃত্তি বা গান করত। তারপর সেই মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে সকলে ভাগ করে খেত এবং যে লোকটি পশু বধ করে গানে, আবৃত্তিতে যজ্ঞটি নিষ্পন্ন করত, সে-ও তার পরই পশুপালক হয়ে দলে যোগ দিত। এই ছিল প্রাথমিক পর্বের যজ্ঞ। পশুচারীদের মধ্যে চালু ছিল বলে এ যজ্ঞপদ্ধতির কয়েকটি স্থায়ী লক্ষণও ওই জীবনযাত্রার দ্বারা নিরূপিত হয়েছিল। যেমন, এরা নিজেরা যাযাবর ছিল বলে এদের কোনও মন্দির ছিল না, কোনও দেবমূর্তিও ছিল না। বেদি ছিল পরিষ্কার-করা এক টুকরো জমি। ওই বেদির ওপরে দেবতাদের উদ্দেশে স্তব করে নিজেদের অভ্যস্ত খাদ্য— পশুমাংস, মধু, দুধ, ঘি, ইত্যাদি নিবেদন করত এবং যা তাদের প্রয়োজন তার জন্য প্রার্থনা করত। কী সেই স্তবস্তুতি? দেবতাদের বর্ণনা আর পূর্বে তাঁরা ভক্তদের যা যা দিয়েছেন তার উল্লেখ করে প্রশংসা। আর প্রার্থনা হল: শত্রুজয়, দীর্ঘজীবন, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, পুত্রসন্তান, ধনসম্পত্তি (প্রধানত গোধন) এবং সর্বোপরি খাদ্য।

ইতিহাসের প্রথম পর্বে মানুষ ফলমূল সংগ্রহ করত; তার পরে শিকার করে মাংস সংগ্রহ করত। তার পরের পর্যায়ে সে পশুপালন করত। শিকার পাওয়া খানিকটা অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু পশুপালনে খাদ্যসংস্থান অনেক বেশি নিশ্চিত ছিল। ভারতবর্ষে আসবার সময়েও আর্যরা যাযাবর পশুচারীই ছিল, অনেক পরে প্রাগার্যদের কাছে চাষ করতে শিখেছিল। এ দেশে এসে তারা প্রাগার্যদের হারিয়ে দেয়। পরাজিতদের একটি অংশ আর্যদের দাসে পরিণত হয়, বাকিরা বিন্ধ্য পর্বতমালার কাছের অরণ্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। আর্যরা ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পঞ্জাবে ও পরে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ দখল করে বসবাস করতে থাকে। বনজঙ্গল পুড়িয়ে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াতে থাকে, তত দিনে তারা প্রাগার্যদের কাছ থেকে চাষ করতে শিখেছে।

তার আগে প্রথম যখন প্রাগার্যদের সঙ্গে সংঘাত হয়, তখনো আর্যরা পশুপালকই ছিল এবং প্রাগার্যদের সম্পত্তি ও খাদ্য লুটপাট করে খাবার সংগ্রহ করত, শিকারও করত, বনে ফলমূল সংগ্রহও করত। কিন্তু এ সব মিলিয়েও যা খাবার জুটত তা তাদের প্রয়োজনের

তুলনায় কম ছিল। শিকারের যুগ থেকে পশুপালনের যুগ পর্যন্ত খাদ্য সংকট তাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। শিকার পাওয়া ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করত, আর পশুপালনেরও নানা বিপদ ছিল; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে ঘাসের জমি নষ্ট হয়ে গেলে পশুপালের খাদ্যের অভাব হত এবং তখন পুরনো চারণভূমি ছেড়ে নতুন চারণের উদ্দেশে যেতে হত। এ ধরনের অনিশ্চয়তা লেগেই থাকত। তা ছাড়া পশুপালে মাঝে মাঝে মড়ক দেখা দিত, তখন পশুপালকদের খাবার— দুধ ও মাংসে টান পড়ত। খাবারের জোগানে এই রকম অনিশ্চয়তাতে আর্যরা অভ্যস্ত ছিল। কাজেই দেবতাদের কাছে খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা তাদের নিত্যকার প্রধান একটি প্রার্থনা ছিল। এই অংশে আমরা বেদের পূর্বভাগ হিসেবে শুধু ঋগ্বেদ সংহিতা নিয়েই আলোচনা করব।

ঋগ্বেদের কিছু অংশ হয়তো আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার আগেই রচনা করেছিল। এই অংশে এবং পরে এ দেশে এসেও তারা যে ঋক্‌গুলি রচনা করে তাতেও খাদ্যের জন্যে বিস্তর প্রার্থনা আছে। এ সব প্রার্থনায় খাদ্যের নানা প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন বিশেষত 'আস্য' রচনা— যা মুখে মুখে রচিত এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত— তাতে প্রতিশব্দ-প্রয়োগ বিলাসিতা। কোনও প্রাচীন আস্য সাহিত্যেই এক অর্থে বহু প্রতিশব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। তবু, এক ঋগ্বেদেই অন্নের চোদ্দটি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়: অন্ন, অন্ধস্, ইষ, বাজ, পৃক্ষ, পিতু, ভক্ত, শ্রবস্, স্বধা, ঊর্জ, ইলা, চন, নমস্ ও বয়স্। এখন এর কয়েকটি হয়তো আঞ্চলিক প্রতিশব্দ, দু-চারটি হয়তো বা কোনও বিশেষ ধরনের খাদ্য বোঝাত। তা হলেও এতগুলি প্রতিশব্দে তখনকার সমাজে খাদ্যের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাই বোঝাত। নানা নামে অভিহিত হয়ে খাদ্যের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা যেন বিশেষ একটি তাৎপর্য পেয়েছে।

খাদ্যের প্রার্থনা কোন দেবতার কাছে করা হত? ঋগ্বেদে খুব কম দেবতাকেই বিশেষ কোনও অভীষ্টের জন্য আহ্বান করা হত। বায়ুবাতাঃ, পর্জন্য, আপঃ, নদঃ— এগুলি প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রকাশ, যেমন, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি। কিন্তু প্রার্থনার বেলায় এঁরা কেউই বিশেষ কোনও অভীষ্ট বস্তু দানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। মোটের ওপরে অধিকাংশ দেবতার কাছেই প্রায় সব রকমের কাম্যবস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু খুব অবাক লাগে যখন দেখি, খাদ্যের জন্যে বেশ ছোট ছোট, অর্থাৎ কম তাৎপর্যপূর্ণ এমন সব দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যাঁদের উদ্দেশে ঋক্‌ও কম, দেবমণ্ডলীতে যাঁদের গুরুত্বও কম। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশ সূক্ত, তাই খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা তাঁর কাছেই সবচেয়ে বেশি। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, অশ্বিনৌ, উষস্, বরুণ, আপঃ, নদ্যঃ, আদিত্যরা, মিত্র, সবিতা, সূর্য, সোম (পবমান)— এঁরাও ঋগ্বেদে প্রধান দেবতাই, এঁদের কাছে খাদ্যভিক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু বেশ কিছু অপেক্ষাকৃত গৌণ দেবতার কাছেও খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে: বৈশ্বানর, দ্রবিণোদা (অগ্নি), পূষা, রুদ্র, সরস্বতী, অপাং নপাৎ, নদী, অরণ্যানী, দধিক্রাবা, ঋভবঃ, শুদ্ধাগ্নি, ত্বষ্টা, এমনকী ইন্দ্রের দুটি ঘোড়া— হরীও বাদ যায়নি। এর থেকে মনে হয়, স্তোতারা এ ব্যাপারে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। কে জানে কোন দেবতার বিশিষ্ট কী

কী ক্ষমতা আছে? সকলকেই বলা রইল, যাঁর যা সাধ্য আছে দিয়ে দেবেন। খাদ্যের টানাটানির যুগে এটা স্বাভাবিক।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে মোটামুটি যে দু-ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে দেবতাদের প্রশংসা বা স্তব বাদ দিলে থাকে প্রার্থনা। আগেই দেখেছি, এ সব প্রার্থনা নিরাপত্তা, পরমায়ু, সম্পত্তি ও খাদ্যের জন্যে। খাদ্য নিয়ে ঋগ্বেদে প্রার্থনা প্রচুর। ভাষায় প্রকারভেদ আছে, কিন্তু মূল সুরটা একই:

> '(অগ্নি) আজ তুমি সুমনা হয়ে খাদ্যবিষয়ে, আমাদের দানশীল রক্ষক হয়ো— ইষং পৃণ্বতাং সুকৃতে সুদানব তা বর্হিঃ সীদতং নরাঃ'; (১:৩৬:২) '(অশ্বিদ্বয়) তোমরা সৎকার্যকারীকে অন্নে ভরিয়ে দিও'; (১:৪৭:৮) 'দেব ইন্দ্র নানা রকম খাদ্য দিয়ে আমাদের পূর্ণ কর ব্যাপ্ত ভূমিতে— ত্বং ত্যাং ন ইন্দ্র দেব। চিত্রমিষমাপো ন পীপয়ঃ পরিজান্'; (১:৬৩:৮) '(অশ্বিদ্বয়) আমাদের জন্যে খাদ্য বহন করে এনো— আ ন উর্জং বহতামশ্বিনা যুবন।' (১:১৫৭:৪)

এ সব থেকে দেবতাদের কাছে খাদ্যের জন্যে মিনতি স্পষ্টই বোঝা যায়:

> 'ইন্দ্র ঊর্ধ্বে অন্নের দাতা— ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা'; (১:৩৬:১৩) 'উষা অন্ন দাও— উষো বাজং হি বংস্ব'; (১:৪৮:১২) 'সমস্ত স্তোতাদের অন্ন দিও— বিশ্বে সচস্ত প্রভৃথেষু বাজম্'; (১:১২২:১২) 'আমরা যেন অন্ন, খাদ্য, সুরক্ষা সুখ ভোগ করি— ইষমুর্জং সুক্ষিতিং স্যুম্নমশ্যুঃ'; (২:১৫:৮) 'কীর্তির জন্যে অন্ন মুক্ত করে দিও— বাজং শ্রুত্য অপাকৃধি'; (২:১:৬) 'আমরা নিশ্চিত সুরক্ষার জন্যে অন্নলাভের জন্যে (স্তুতি করছি)— স্ফারবৃক্তাভিরূতীভী রথে মহে সনয়ে বাজসাতয়ে'; (২:৩১:৩) 'উষা আমাদের জন্যে গাভী, অশ্ব, বীর্যযুক্ত (অর্থাৎ যা বীর্য দান করবে এমন) স্তবের উপযোগীয় ও অন্ন দান করুন— সা অস্মাসু ধা গোমদশ্ববদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্যম'; (১:৪৮:১২) 'হে ইন্দ্র যেন ঐশ্বর্য এবং যা অতিশয় দীপ্ত এমন অন্ন, খাদ্য লাভ করি— সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুচন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ'। (১:৫৩:৫) অন্নই প্রধান প্রার্থিত বস্তু; এরই জন্যে ভক্তের আর্তি। 'যে স্তব করছে তার জন্যে সুন্দর অন্নের ব্যবস্থা কর— বর্ত ধিয়ং জরিত্রে বাজপেশসম'; (২:৩৪:৬) 'অন্নের ব্যবস্থা কর যেন রথের ঘোড়াও আমি লাভ করি'; (২:৩২:৭) 'ইন্দ্র ও অগ্নি তোমাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা করছি— ইন্দ্রাগ্নী ইষং তা আবৃণে।' (৩:১২:৫)

নানা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কাছে অসংখ্য বার এই ধরনের প্রার্থনা করেছেন।

ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে আমাদের রক্ষা কর, স্তোতাদের পালন কর, আর অন্নে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর। এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, 'অন্নে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর।' অন্ন কি তারা তখন আহার করছিল না? করছিল; তবে সে আহার কখনও জুটত, কখনও জুটত না; কারও কারও জুটত, কারও কারও জুটত না; কখনও প্রয়োজন মতো পরিমাণে জুটত, কখনও অর্ধাহার বা স্বল্পাহারে দিন কাটাতে হত। অর্থাৎ প্রয়োজনের

অনুপাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আহার সকলের জুটত না। একটা অনিশ্চয়তা ছিল, ফলে অন্নাভাবের, অনিয়মিত পরিমাণের আহারের আতঙ্ক ছিল। দেবতার কাছে প্রার্থনা— অন্নে 'অধিকার' প্রতিষ্ঠা কর। অধিকার থাকলে প্রভুত্ব থাকে, প্রয়োজন মতো অন্ন প্রতিদিনই পাওয়া যায়। সেইটে তখন পাওয়া যাচ্ছিল না বলে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আহারের নিশ্চয়তার জন্য এই প্রার্থনা: 'সুরক্ষা ও অন্নই মুখ্য অভীষ্ট— রক্ষা চ ন মঘোনঃ পাহি সুরীন রায়ে চ নঃ স্বপত্যা ইষে ধাঃ।' (১:৫৩:৫) আনুষঙ্গিক নানা কাম্যবস্তু, সূক্তগুলির মধ্যে মাঝেমাঝেই অনুপ্রবেশ করছে যেমন দেখেছি গাভী, অশ্ব, রথের বাহন। কিন্তু মূল ভিক্ষা হল, 'তিনি আমাদের অনেক খাদ্য দিন— স নো যক্ষি মহীমিষম।' (৪:৩২:৭) এই প্রার্থনাটি অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে: প্রচুর অন্ন দাও। নানা ভাষায় 'প্রচুর অন্ন'-র জন্যে দেবতাদের কাছে স্তুতি করে প্রার্থনা করা হয়েছে। এর থেকে একটিই সিদ্ধান্ত করা যায়: অন্ন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল না। যথেষ্ট পরিমাণের অর্থ হল, প্রয়োজন মিটবার মতো। প্রয়োজন উদরপূর্তির এবং বল ও শক্তিলাভের জন্য যা পর্যাপ্ত।

মনে রাখতে হবে, যাযাবর পশুচারী আর্যদের জীবনযাত্রা কঠোর ও প্রচুর শ্রমসাধ্য ছিল। ফলে তারা যেমন শারীরিক পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিল, তেমনই তাদের ক্ষুধা ও পুষ্টির প্রয়োজনও বেশি ছিল। ভারতবর্ষে এসে তারা যতটুকু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছিল, স্পষ্টতই তা প্রয়োজনের অনুপাতে পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে উদরপূর্তিও হত না, পুষ্টিও হত না। তারা অপুষ্টিজনিত নানা ব্যাধিতে ও রোগে আক্রান্ত হত; যক্ষ্মার কথা ও অন্যান্য অপুষ্টির রোগের কথা অথর্ববেদে পাই। তাই অন্নের প্রাচুর্যের জন্য এ ধরনের প্রার্থনা বারে বারেই উচ্চারিত হয়েছে। নানা ভাষায় প্রাচুর্য বর্ণনা করা হয়েছে, 'শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে' 'অন্নের ধারা', 'গাভীযুক্ত অন্ন' অর্থাৎ অন্ন, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা বহু দেবতার কাছেই করা হয়েছে। এ সবের দ্বারা প্রমাণ হয় খাদ্য খানিকটা জুটত, কিন্তু সকলের নয়, খিদে মেটাবার মতো পরিমাণে নয়, পুষ্টিজনক নয়, প্রচুরও নয়। অসংখ্যবার তাই অন্নে প্রাচুর্যের জন্যে নানা ঋষি নানা দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন। এতে সমাজে খাদ্যাভাবের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> 'স্তোতাদের জন্য অন্ন বহন করে আনো— ঈষং স্তোতৃভ্য আ ভর'; (৫:৬:২,৩) 'অন্নলাভের পথ দেখিয়ে দাও— রৎসি বাজায় পন্থাম্'; (৫:১০:১) 'অন্নপ্রাপ্তির জন্য দান কর— আ বাজং দর্ষি সাতয়ে'; (৫:৩৯:৩) 'যারা স্তব করে তেমন ধনীদের জন্য, অন্ন দান কর— ইষং স্তোতৃভ্য মঘবদ্ভ্য আরট্'; (৭:৭:৭) 'আমরা পার হয়ে গিয়ে অন্ন লাভ করব— বয়ং তরুত্রা সনুয়াম বাজম্'; (৭:২৬:৫) 'হে ইন্দ্র নানা ধরনের অন্ন প্রকাশ কর— স ইন্দ্র চিত্রাঁ অভি তৃণহি বাজান্'; (৬:১৭:২) 'যেন অন্ন লাভ হয়— ভুবৎ বাজস্য সাতয়ে।' (৫:৯:৭)

'বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে বলা হচ্ছে তিনি 'অন্ন বর্ষণকারী'— পৃক্ষস্য বৃষ্ণঃ।' (৬:৮:১) উষাকে বলছে 'হে অন্নবতী, শোভন দীপ্তিসহ অন্নের প্রেরয়িত্রী হও— সুংদ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহিসং বাজেন বাজিনীবতি।' (১:৪৮:১৬) কেন অন্ন চাই? 'পুষ্টির জন্যে'— ঈষমশ্যাম ধায়সে।' (৫:৭০:২) সেই জন্যে বলছে, 'শ্রেষ্ঠ অন্ন আমাদের জন্যে বহন করে আনো—

ঈষমা বক্ষীহীষং বর্ষিষ্ঠাম্।' (৬:৪৭:৯) খাদ্যেরও ভালমন্দ আছে, পুষ্টিরও কমবেশি আছে। তাই সবচেয়ে পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ, বলদায়ী অন্নের জন্যে বারে বারেই প্রার্থনা শোনা যায়। 'সবচেয়ে বলযুক্ত অন্ন প্রশস্ত মনে করেন বিদ্বান্‌রা— শবিষ্ঠং বাজং বিদুষো চিদধ্বম্।' (৫:৪৪:১০) বা 'উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণ অন্নলাভের জন্যে— মহো বাজস্য গধ্যস্য সাতৌ।' (৬:২৬:২) অথবা 'প্রশংসনীয় অন্নলাভের জন্য— বাজস্য রাধ্যস্য সাতৌ।' (৬:১১:৬)

কেমন সে অন্ন? 'খাদ্যের মধ্যে কাম্য অন্ন— ইষঃ পৃক্ষ ইষিধঃ...।' (৬:৬৩:৭) 'সুরক্ষার জন্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী অন্ন এনে দাও— ভর বাজং নেদিষ্ঠমূতয়ে।' (৮:১:৪) 'নিকটবর্তী অন্ন' শুনলে সহসা অর্থবোধ হয় না। যখন কৃষিভূমিতে নিয়মিত উৎপাদন হচ্ছে না তখন অন্নকামী মানুষ মৃগয়া, লুণ্ঠন ও প্রাগার্যদের ফসল কেড়ে নিয়ে অন্নসংস্থান করত। নিজস্ব কৃষিভূমি বা বাস্তুর কাছাকাছি— যার কাছে নিজস্ব বা গোষ্ঠীগত পশুচারণভূমি— এগুলি কেড়েকুড়ে দখল করে নিতে সময় লাগা সম্ভব। ততদিন পর্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে প্রয়োজন মতো অন্ন সংগ্রহ করা অনিশ্চিত ছিল। তাই এ ধরনের প্রার্থনা:

> 'হে অন্নপতি আমাদের বীর্যদায়ী ধন দাও— স ত্বং ন উর্জাং পতে রয়িং ধাস্ব সুবীর্যম্'; (৮:২৩:১২) 'ইন্দ্র হলেন যশযুক্ত অন্নের অধিপতি— ইন্দ্রো বাজস্য দীর্ঘশ্রবসস্পতি'; (১০:২৩:৩) 'এই অগ্নি হলেন শত সহস্র অন্নের অধিপতি— অয়মগ্নিঃ সহস্রিণো বাজস্য শতিনস্পতিঃ'; (৮:৭৫:৪) 'প্রচুর পরিমাণে অন্ন দিতে পারেন, প্রচুর পরিমাণে অন্ন দাও, (পবিত্র কর) সোম, যার সঙ্গে গাভী আছে, হিরণ্য আছে, অশ্ব আছে, শক্তি আছে,— আ পবস্ব মহীমিষং গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ। অশ্ববদ্বাজবৎ সুতঃ; (৯:৪১:৪) 'প্রচুর কাম্য অন্ন ও ধন (দাও)— মহীমিষং দধাসি সানসিং রয়িম্; (১০:১৪০:৫) 'অন্ন দাও, উজ্জ্বল অন্ন দাও— বয়ো দধে রোচমাণো বয়ে দধে'; (৯:১১১:২) 'আমাদের সহস্র পরিমাণ অন্ন এনে দাও, সোম— ইন্দ বা ভব বিদাঃ সহস্রিণীরিষাঃ'; (৯:৪০:৪) 'ইন্দ্র, আমাদের কাছে শতপরিমাণ সহস্রপরিমাণ অন্ন নিয়ে এস— ইন্দ্র ণ উপা যাহি শতবাজয়া। ইষা সহস্রবাজয়া'; (৮:৯২:১০) 'সহস্র পরিমাণ অন্ন নিয়ে যেতে যেতে...— গচ্ছন্ মাবাজং সহস্রিণম্'; (৯:৩৯:১) 'সোম এই সোমযোগে যেন প্রচুর অন্ন পাই (সে ব্যবস্থা কর)— আ নো ইন্দো মহীমিয়ং পবস্ব (৯.৬৫:১৩) অথবা পবস্ব বৃহতীরিষ।' (৯:৪২:৬)

এই শত পরিমাণ সহস্র পরিমাণ, ঠিক কতটা পরিমাণ বোঝাত তার কোনও স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু কথ্যভাষায় যেমন 'শ'য়ে শ'য়ে, 'হাজারে হাজারে' বলে আমরা প্রচুর পরিমাণ বোঝাতে চাই এখানে মনে হয় সেই ব্যঞ্জনাটাই অভিপ্রেত। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ অন্নের জন্যে আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা। বাস্তবে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলে এ সব প্রার্থনার দরকার হত না। প্রাচুর্যের জন্যে প্রার্থনার পিছনে থাকে বাস্তবে অন্নাভাব। তাই এত ভাবে ওই কথাটাই বলা হচ্ছে।

খাদ্যের জোগান যেন কেউ আচ্ছাদিত করে রেখেছে তাই ভক্ত দেবতাকে বলছে, 'অন্নের ওপরের আচ্ছাদন তুলে দাও অর্থাৎ মুক্ত কর অন্নের রাশিকে— উর্ণুহি বি বাজান্।' (৯:৯১:৪)

দেবতা ইচ্ছা করলে মানুষকে প্রচুর অন্ন দিতে পারেন, যখন দেন তখন কোথাও না কোথাও যেন একটি অন্নভাণ্ডার আছে, তার থেকেই দেন; তাই প্রার্থনা: উন্মুক্ত কর সে ভাণ্ডার, ঢেকে রেখো না, আমাদের বঞ্চিত কোরো না। অকৃপণ হস্তে অন্নদান করবার জন্যে এ ধরনের আরও বহুসংখ্যক প্রার্থনা থেকে বোঝা যায় সমাজে বৃহৎ একটি অংশ পর্যাপ্ত অন্ন পাচ্ছিল না, তাই এই আকুতি। বারংবার একই কথা নানা ভাষায় নানা দেবতাকে বলা, যেন কোনও না কোনও দেবতা কৃপাদৃষ্টিতে ভক্তের দিকে তাকান, তার অন্নাভাব মোচন করেন।

প্রয়োজন শুধু অন্নের নয়, দুধের জন্যে গাভী চাই; নিরাপদে থাকবার জন্যে যুদ্ধ করতে হয়, তাই রথে বাহন অশ্বও চাই; দরকার বীরপুত্রেরও। তাই বারেবারে গাভী, অশ্ব ও পুত্রের জন্য প্রার্থনাও জুড়েছে অন্নের প্রার্থনার সঙ্গে:

> 'হে সোম, গাভী, বীর, অশ্ব সমেত অন্নের জন্যে তোমাকে প্রস্তুত করছি, এর থেকে আমাদের প্রতিদিন প্রচুর খাদ্য দাও— গোমন্নঃ বীরবদশ্ববদ্বাজবৎ সুতঃ। পবস্ব বৃহতীরিষঃ'; (৯:৪২:৬)
> 'দেবতা তোমরা আমাদের জন্যে প্রতিদিন ধন ও খাদ্য আনো— রায়েষাং নো নেতা ভবতামনু দ্যূন্।' (৩:২৩:২)

খাদ্যের প্রয়োজন শুধু উদরপূর্তির জন্যে নয়, শক্তির জন্যেও। মনে রাখতে হবে, আর্যরা এসে পড়েছিল এক প্রতিকূল পরিবেশে। তখন আর্যাবর্তে ব্যবহারিক জীবনে অনেক বেশি উন্নত সিন্ধুসভ্যতার প্রভাব। যুদ্ধে হোক বা প্রতাপে-পরাক্রমে হোক তাদের হটিয়ে দিয়ে আগন্তুকরা এখানে বসবাস করত। অতএব দ্বন্দ্ব সংগ্রাম লেগেই থাকত, এ সব সংগ্রামে শক্তিমান যোদ্ধার দরকার এবং তাদের শক্তি জোগায় খাদ্য। তাই খাবারে ঘাটতি থাকাটা আর্যদের পক্ষে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ব্যাপার। এই জন্যেই খাদ্যের জন্যে এত তীক্ষ্ণ আর্তি। উষার মহিমা এই জন্যেই যে তিনি 'শক্তি ও অন্ন বহন করে আনেন— বাজমূর্জং বহন্তীঃ'; (৬:১:৫) 'আকাশ ও পৃথিবী আমাদের শক্তিরূপে (অন্ন) দিন— উর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী পিন্বতাম্'; (৬:৭০:৬) '(বায়ু) স্থূল (= প্রচুর) শুভ্র মেদযুক্ত অন্ন দিন— পীবো অন্নাঁ বয়িবৃধ সুমেধা শ্বেতঃ সিষক্তি'; (৭:৯১:৩) 'যে অন্ন আমাদের বৃদ্ধি ঘটায় সেই খাদ্য দান কর— ধক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষমা বা চনঃ।' (৮:১৩:১৫) এই রকমই শুনি '(বায়ু) দান করেছিলেন পুষ্টিবর্ধক খাদ্য, অন্ন— অধুক্ষৎ পিপ্যুষীমিষ উর্জম্।' (৮:৭৩:১৬)

এই অন্ন গ্রহণ করেও তো মানুষ অনেক সময়ে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাই ভক্ত সন্তর্পণে নিবেদন জানায় যাতে যে-অন্নের দ্বারা রোগ নিবারণ হয়, দেবতা যেন তেমন অন্নই দান করেন: 'যক্ষ্মারহিত অন্ন প্রচুর পরিমাণে— অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ'; (৯:৪৯:১) '(দেবতা) দোহন করে দাও পুষ্টিবর্ধক অন্ন— ধুক্ষস্ব পিপুষীমিষম্।' (৯:৬১:১৫) অগ্নির কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, 'অগ্নি আয়ু সৃষ্টি কর, শক্তি এবং অন্ন (সৃষ্টি করে দাও)— অগ্ন আয়ূষি পবস আ সু বোর্জমিষং চ নঃ'; (৯:৬৬:১৯) 'যশের জন্যে মঙ্গলযুক্ত অন্ন ভোগ করব— উর্জং বসানঃ শ্রবসে সুমঙ্গলঃ।' (৯:৮০:৩) দেবতা হলেন 'খাদ্যের অধিপতি, পুষ্টির অধিপতি ও সখা—

ইনঃ বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।' (১০:২৬:৭) এখানে 'সখা' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজে বন্ধু তার বন্ধুর আতিথ্য করে পুষ্টিযুক্ত অন্ন দিয়ে; দেবতা যখন তা করেন তখন তিনি মানুষের প্রতি সখার কৃত্যই করেন। দেবতা অনুকূল না হলে, সখা না হলে ভয়স্থান। যিনি ভক্তের প্রয়োজন জেনেও তাকে বিমুখ করেন অথবা তার প্রার্থনায় উদাসীন থাকেন তিনি তো তখন ভক্তের 'সখা' নন, উদাসীন। ভক্তের প্রার্থনা দেবতাকে তার প্রতি অনুকূল করে রাখা। দেবতা অনুকূল না থাকলে ভক্তের ভরসা কোথায়? তার নিজের চেষ্টায় সে তো পর্যাপ্ত অন্ন উৎপাদন করতে পারছে না। যা উৎপন্ন হচ্ছে তাতে খিদে মেটে না। বহু মানুষই সমাজে অভুক্ত থাকছে, যারা খেতে পাচ্ছে তারাও নিয়মিত ভাবে পাচ্ছে না এবং সর্বোপরি যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছে না; এমন খাদ্য পাচ্ছে না যাতে তাদের আয়ু ও পুষ্টি বৃদ্ধি পায়। এ সব সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে উপায় তারা ভাবতে পেরেছিল তা হল যজ্ঞে স্তব ও হব্য দান করে দেবতাকে অনুকূল করে তাঁর কাছে মিনতি করা যাতে তিনি সখার মতো আচরণ করেন। প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও কৃপণতার বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র আশ্রয় হল দেবতার আনুকূল্য। পুষ্টিই অন্নর জন্যে প্রার্থনার মূলে। পুষ্টি থেকে আসবে শক্তি, এবং শক্তিমান্ জয়যুক্ত হবে। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর ওপরে আধিপত্যই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় এবং এ সবের মূলে অন্ন, তাই অন্ন পুষ্টির উৎস।

শুধু পুষ্টি নয়, অন্ন জীবনেরই সমার্থক। 'যাকে গৃহ ও জীবনসাধন অন্ন দিয়েছ— যস্মা অরাসত ক্ষয়ং জীবাতুং চ।' (৮:৪৭:৪) তাই প্রার্থনা, 'পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যেন অন্ন ভোগ করি— পুত্র পৌত্রাদিভির্ভোজমশ্নম্।' (৮:৯৩:১৫) এখন প্রশ্ন আসে: সেই যুগের মানুষগুলির কাছে অন্নের রূপ কী ছিল? 'ভক্ষঃ সখা', খাদ্য হল বন্ধু (তৈত্তিরীয় সংহিতা; ২:৬:৭:৩) 'আপঃ (জল দেবতা) যাকে দীপ্ত করে অন্নের সেই সোনা-রং ঘৃত মিশ্রিত অন্ন...' (তৈ/সং; ২:৩৫:১:১) 'পৃশ্নি (রুদ্রদের মাতা) সে-ই হল অন্নের রূপ— পৃশ্নির্ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপম্; (তৈ/সং; ২:১:৭:৫,৫:৫:৬:৩) 'অন্ন হল প্রজাসাধারণ— অন্নং বিট্; (তৈ/সং; ৩:৫:৭:২) 'অন্ন শক্তি— অন্নং বৈ বাজঃ; (তৈ/সং'; ৫:১:২:২) শুধু তাই নয়, অন্নকে বহু দেবতার সঙ্গে একাত্ম কল্পনা করা হয়েছে, 'অন্ন আদিত্য, অন্ন মরুদ্গণ অন্ন গর্ভ— অন্নং বা আদিত্যোঽন্নং মরুতো অন্নং গর্ভা' (তৈ/সং; ৫:৩:৪:৩) অন্নের পুষ্টিতেই গর্ভধারণ করা সম্ভব তাই এখানে অন্নকে গর্ভও বলা হয়েছে। তেমনই আবার শুনি 'অন্ন অগ্নি... বিরাট (ছন্দ)ই অন্ন— অন্নং বৈ পাবকঃ... বিরাভন্নম্'। (তৈ/সং; ৫:৪:৬:৩) 'অন্ন বরণীয়— অন্নং বামঃ'। (তৈ/সং; ৫:৪:৭:২; ৬:১:৬; ৭:৫:৮:৩)

সেই প্রাচীন প্রথম পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্যেই অন্নের যখন এত গৌরব কীর্তন, তখন স্বভাবতই মনে হয়, ক্ষুধা সম্পর্কে একটা আতঙ্কের মনোভাব জনমানসে কার্যকরী ছিল। সাধারণ মানুষ বলে সমাজে যাদের স্বীকৃতি আছে তারা সাধারণ খাবারই খেত; যারা তা পেত না তারা অন্য হীন খাদ্য যেমন তেমন করে জোগাড় করে খেত। সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষ চণ্ডাল, আর্যসমাজের বাইরে অস্পৃশ্য একটি গোষ্ঠী। আর্যরা তাদের বরাবরই

ঘৃণা করে এসেছে, কারণ তারা শ্বপাক বা শ্বপচ অর্থাৎ শ্বন্ বা কুকুরের মাংস পাক করে খায়। অন্য মাংস কিনতে হয়, এ দরিদ্র গোষ্ঠীর সে ক্ষমতা কোথায়? তাই যা কিনতে হয় না, পথেঘাটে ঘুরে-বেড়ানো কুকুর মেরে খেত এই চণ্ডালরা— পেট ভরাবার জন্যে, কতকটা বা পুষ্টিরও জন্যে। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ বামদেব ঋষি বলছেন, 'অভাবের জন্যে আমি কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছি; দেবতাদের মধ্যে কোনও সাহায্যকারী পাইনি, (নিজের) স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেছি, পরে এক শ্যেন আমার জন্যে মধু আহরণ করে।' (অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে, ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্। অপশ্যং জায়ামহীয়মানামধা মে শ্যেনো মধ্বা জভার।। ঋগ্বেদ; (৪:১৮:১৩) এর ওপরে মন্তব্য করবার প্রয়োজন নেই। কতখানি অভাব থাকলে চণ্ডালের খাদ্য, অর্থাৎ কুকুরের মাংসও জোটে না, তাই কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেতে হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আপন স্ত্রীকে অপমানিত হতে দেখেন, যেমন লাঞ্ছনা বহু দরিদ্র স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে; মানুষ তো দূর, দেবতাদের মধ্যেও কোনও সহায়ক খুঁজে পাননি বামদেব, শেষে কোনও বাজপাখির সঞ্চয় থেকে মধু খেয়ে প্রাণরক্ষা করেন। লক্ষণীয় এই শাস্ত্রাংশটি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋষিমণ্ডলগুলির (দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল) অন্তর্গত। অর্থাৎ, এখানে বামদেবের যে ক্ষুধার তাড়না তাতে ঋষি বাধ্য হয়ে চণ্ডালও যা ফেলে দেয় সেই কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রেঁধে খাচ্ছেন। এটি বেদের প্রাচীনতম যুগেরই একটি সমাজচিত্র। এখানে লক্ষণীয়, দেবতাদের মধ্যে কেউ-ই তাঁকে সাহায্য করেননি। দেবতা কী ভাবে সাহায্য করতেন? কোনও মানুষের চিত্তে করুণা উদ্রেক করে, যাতে অভুক্ত ঋষিকে সে খেতে দেয়। কিন্তু কেউ দেয়নি, অর্থাৎ বামদেবের দুঃসহ ক্ষুধার যন্ত্রণাতে দেবতা বিমুখ, মানুষও। কেউ ডেকে খাওয়ায়নি তাঁকে। এ অবস্থার পেছনে খাদ্যাভাবের ত্রাসও আছে। অর্থাৎ মানুষ হয়তো ইচ্ছে থাকলেও সাহস পায়নি তার খাদ্য ভাগ করে খেতে— যদি তারও ওই অবস্থা হয়? সমাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য থাকলে এ-অবস্থা হত না। প্রত্যেক সমাজেই কিছু মানুষ থাকে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না— শিশু, প্রসূতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ; সমাজ এদের জন্যে অন্নসংস্থান রাখে। বামদেবের কথায় মনে হয়, তাঁর অন্ন উৎপাদনের সাধ্য বা সঙ্গতি ছিল না এবং সমাজেও সেই পরিমাণ প্রাচুর্য ছিল না যাতে অভুক্তকে আহার দেওয়ার আতিথেয়তা আসে। এখানে ব্যাপক একটি খাদ্যাভাবের পটভূমিকা দেখা যাচ্ছে। খাদ্য যথেষ্ট নেই বলেই হয়তো মানুষ কৃপণ ও অনাতিথেয়। এই কার্পণ্য এমন বলেই বামদেব বলছেন দেবতারাও কেউ সাহায্য করলেন না। দরিদ্র বলে তিনি অভুক্ত, তাঁর স্ত্রী লাঞ্ছিত।

ঠিক এই ধরনের কথা পড়ি প্রাচীন আক্কাদীয়দের এক দরিদ্রের রচনায়। সে তার দুর্দশার দীর্ঘ বিবরণের পরে বলে, 'কোনও দেবতাই সাহায্য করেননি, কেউ আমার হাত ধরেননি।'[৩]

৩. 'No god helped, [none] seized my hand.' 'Akkadian observations on life and world order' পরিচ্ছেদ, *Ancient Near Eastern Text* (ed) J P Pritchard, Princeton, 1955 p.

অন্যত্র ভক্ত বলছেন, '(হে ইন্দ্র) গাভী দিয়ে উত্তীর্ণ হব দারিদ্র্যজনিত কষ্ট, সকল ক্ষুধা উত্তরণ করব যব দিয়ে— গোভিষ্টন্মেমামতিং পু রেবাং যবেন ক্ষুধং পুরুহুত বিশ্বাম্।' (১০:৪২:১০) এই দশম মণ্ডলটি রচনার ও সংকলনের দিক থেকে সবচেয়ে অর্বাচীন, এখানে তখনকার প্রচলিত খাদ্যশস্য যবের উল্লেখ আছে নাম করেই; এই যব দিয়ে পুরোডাশ্ (অনেকটা দক্ষিণ ভারতীয় ইড্লির মতো) তৈরি হত, যা ভাত বা রুটির মতো প্রধান একটি খাদ্য ছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ক্ষুধা বর্তমান, এবং তা নিবারণ করবার উপায়ও ভাবছে ভক্তরা।

'যেন খেতে পাই'— এ প্রার্থনাটা ব্যাপ্ত হয়ে আছে সারা বৈদিক সাহিত্য জুড়ে। 'অকুটিলগতি (সরলচিত্ত) আমরা খাদ্য লাভ করব— অপরিহবৃতাঃ সনুয়াম বাজম্'; (১:১০০:১৯) অর্থাৎ 'আমরা যদি কুটিলতা পরিহার করে নৈতিক ভাবে জীবনযাপন করি, তা হলে, দেবতা আমাদের আহার জোগাবেন', এমন একটা বিশ্বাস মানুষের চেতনায় অন্তর্নিহিত ছিল। সেই গুরুতর খাদ্যাভাবের দিনে ঠিক কী করলে আহার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসে তা কেউ ঠিক করে জানত না, তাই চিত্তশুদ্ধিকে খাদ্যলাভের একটা প্রাক্শর্ত হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অথবা সরাসরি বলছে, 'ইন্দ্রের দ্বারা আমরা খাদ্য লাভ করব— বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজম্'; (১:১০১:১১) 'আমাদের পথ যেন সুগম ও অন্নযুক্ত হয়— সদা যুগঃ পিতুমাঁ অস্তু পন্থাঃ'; (৩:৫৫:২১) 'অন্ন যেন লাভ করতে পারি— ইলাভিঃ সং রভেমহি'; (৮:৩২:৯) 'প্রজা ও অন্ন যেন ভোগ করতে পারি— ভক্ষীমহি প্রজামিষম্'; (৭:৯১:৬) 'যেন অন্নের ওপরে (আমাদের) অধিকার থাকে; যেন অন্নের সবচেয়ে নিকটে থাকতে পারি— ভবা বাজানাং পতিঃ। নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম'; (৯:৯৮:১২) 'নেদিষ্ঠতমা', সবচেয়ে নিকটবর্তী, অর্থাৎ অন্নের সঙ্গে যেন আমাদের কোনও দূরত্ব না থাকে। এর মানেটা হল, যেন সহজেই অন্ন লাভ করতে পারি। 'অন্নের গন্ধযুক্ত খাদ্য যেন খাই, অন্নের গৃহ যেন পাই— অশ্যাম বাজগন্ধ্যং সনেম বাজপস্ত্যম্।' (৯:৯৮:১২)

খাদ্যের জোগানের অবস্থা কী অবস্থায় থাকলে অন্নগন্ধি খাদ্য ও কাম্য হয়ে ওঠে তা বোঝা কঠিন নয়। আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ হল, 'অন্নের গৃহ' কথাটি— এটি শস্যের ভাণ্ডার বা মরাই অর্থে প্রযুক্ত কিনা তা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু কোনও একটা জায়গায় শস্য মজুত থাকার আশ্বাসটাই এখানে প্রয়োজনীয়। যেন 'হা অন্ন, হা অন্ন' অবস্থাটা না ঘটে। বলা বাহুল্য, এমনটা না ঘটে থাকলে এ প্রার্থনা থাকত না। 'অরণ্যানী' সূক্তে যথেচ্ছ স্বাদু ফল খাবার জন্যেও প্রার্থনা আছে— স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্যায় যথাকামং নিপদ্যতে।' (১০:১৪৭:৫) আগেই বলেছি, ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় থেকেই খাদ্য ও পানীয় ছিল পশুমাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, শস্য থেকে তৈরি খাদ্য, অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা ফল, মধু, সোমরস ও সুরা। ফল ও মধুর জন্যে লোকে বনে যেত, শিকার করতেও যেত পশুমাংস সংগ্রহের জন্যে; অবশ্য পরে পশুপালনের যুগে পশুপাল থেকে পশু হনন করে যজ্ঞ করা হত এবং খাওয়া হত; দুধ ও দুধ থেকে তৈরি দই, ঘোল, ছানা, চরু (পায়স) এ সবও খাদ্যের অংশ ছিল। সে যুগে গ্রামের বাইরেই পশুচারণভূমি এবং তার বাইরেই অরণ্য ছিল। গ্রামের চাষের জমি, বাইরে পশুচারণভূমি এবং তার বাইরে

অরণ্যভূমি— এই তিনটি থেকেই মানুষ তার খাদ্য সংস্থান করত।

মানুষ পরিশ্রম করে শিকার, পশুপালন, ফলমূল সংগ্রহ বা চাষ, যা করেই হোক খাবার জোগাড় করত; কিন্তু এর প্রত্যেকটিই নানা ভাবে বিপৎসংকুল ছিল। শিকার পাওয়া, না পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করত ভাগ্যের ওপরে। পশুচারণভূমি নষ্ট হয়ে যেত খরা, বন্যায়; তা ছাড়া মাঝে মাঝে পালে মড়ক লাগত, জঙ্গলে নানা হিংস্র জন্তু ছিল, চাষেও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, ইত্যাদি নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকত। তাই মানুষ কোনও মতেই তার খাবার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। প্রকৃতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ যেটুকু ছিল, তা খুবই প্রাথমিক স্তরের। স্বভাবতই মানুষ কিছু একটা অবলম্বন চাইত যার থেকে তার খাবারের জোগানের সম্পর্কে সে একটা আশ্বাস পায়। এই কারণে সে কল্পনা করল ঊর্ধ্বলোকে কিছু দেবতা তার সুখদুঃখের হিসেব রাখেন। তাঁদের যজ্ঞে ও স্তবে যথাবিধি প্রসন্ন করতে পারলে খাদ্য সম্বন্ধে হয়তো একটা স্থায়ী আশ্বাস থাকে। খাবার যখন মেলে তখন নিশ্চয়ই কোনও দেবতা মানুষের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তা পাঠান বলেই মানুষ তা পায়। যখন মেলে না, তখন কোনও দেবতার অসন্তোষ বা রোষকেই দায়ী করা হত। কাজেই অন্নসংস্থানের সঙ্গে দেবতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত করত সে যুগের জনমানস।

'মন্ত্রদ্রষ্টা প্রশস্ত অন্ন ধারণ করেন— চাক্ষ্মো যদ্বাজং ধরতে মহী।' (২:২৪:৯) কিন্ত এ অন্ন তিনি ধারণ করেন দেবতার কৃপায়। ইন্দ্রকে বারে বারে 'বাজসনি' অর্থাৎ অন্নদাতা বলা হয়েছে। অগ্নিকেও: 'অগ্নি পরম অন্ন ও ধনের (দাতা)— অগ্নির্বাজস্য পরমস্য রায়ঃ'; (৪:১৩:৩) '(দেবতা) দ্রুত আহরণ করে আনেন স্পৃহনীয় (কাম্য) অন্ন— মক্ষু বাজং ভরতি স্পার্হিরাধাঃ।' (৪:১৬:১৬) যে অন্ন সমস্ত ক্ষুধার্তের আকাঙ্ক্ষিত সেই অন্ন দেবতা ভক্তের স্তবে ও যজ্ঞে প্রীত হয়ে দান করেন এমন কথা বারেবারেই বলা হয়েছে। 'ইন্দ্রের স্তব কর, প্রশংসা কর, স্তাবকের জন্যে যেন তিনি স্ফীত নদীর মত অন্ন দান করেন— নু ষ্টুত ইন্দ্র নূ গৃণান ইষং জরিত্রে নদ্যো ন পীপেঃ।' (৪:১৭:১২,২১; ৪:২০:১৬) এ কথা বারে বারে বলার উদ্দেশ্য সম্ভবত ওই উপমাটি যা অন্নকামী ভক্তের মনে ধরেছিল: বর্ষায় ফেঁপে-ওঠা নদীর মতো সুপ্রচুর অন্নসম্ভার। 'ইনি (দেবতা) যাকে দান করেন তার জন্যে অন্ন আহরণ করেন— অয়ং বাজং ভরতি যং সনোতি।' (৪:১৭:৯)

শুধু ইন্দ্র, অগ্নি নয় অশ্বিদ্বয়কেও অন্নদাতা বলে বারে বারে অভিহিত করা হয়েছে। 'অশ্বিনৌ বাজিনী বসূ'— এ কথা অনেক ঋকেই পাই। (৫:৭৫:৬, ৭; ৫:৭৮:৩; ৮:৫:৩; ১২, ২০, ৩০; ৮:২২:৭, ১৪, ১৮; ৮.২৬:৩, ৮:৮৫:৩; ৮:১০১:৮) পূষা, যিনি মুখ্যত পশুপালনের রক্ষক দেবতা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'পূষার স্তব করি, তিনি অজ, অশ্ব ও অন্নের অধিকারী' অশ্ব বাহন— পূষণং ন্বজাশ্বমুপ স্তোষাম বাজিনম্।' (৬:৬০:১) কিন্তু অজ ও অন্ন খাদ্য, তাই পূষার কাছে এ সব চাওয়া প্রাসঙ্গিক। ইন্দ্র শুধু শত্রুজয়ই করেননি অন্নও দান করেন: 'যিনি বৃত্রকে বধ করেছেন, তিনি অন্ন দান করেন, বণিক্‌শ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র কাম্য ধন দান করেন— হন্তা যো বৃত্রং সনিতেতে বাজং দাতা মঘানি মঘবা সুরাধা।'

(৪:১৭:৮) অশ্বিন্‌রাও অন্ন এবং ধন দান করেন: 'দুজনেই অন্ন ও ধনের দাতা। (৬:৬০:১৩) দেবতার অন্নদান প্রকারান্তরে সুরক্ষাও দেয়, কারণ, অন্নপুষ্ট সুস্থ মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ, তাই দেবতা 'আমাদের অন্ন দান করেই সুরক্ষাও দান করেন— দানো বাজং বি যমতে ন উতীঃ।' (৭:৭:৪) অগ্নি অন্নদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— বাজসাতম (৫:১৩:৫, ৫:২০১) '(হে দেবতা) তোমার (দেওয়া) অন্নের শক্তি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করুক— বাজো নু তে শবসস্পাত্বন্তম্।' (৫:১৬:৫)

কণ্ববংশীয়দের ঋষি বংশধরদের সম্বোধন করে বলছেন, 'হে কণ্বরা, স্তবগানে অন্ন (চেয়ে নাও), উত্তম প্রভু, মহাত্মা অন্নপতি দেবতার স্তব গেয়ে অন্নলাভ কর— গাথ শ্রবসং সৎপতিং শ্রবস্বামং পুরুত্মানম্। কণ্বাসো গাথ বাজিনম্।' (৮:২:৩৮) দেবতা স্তবে তুষ্ট হলে ভক্তকে অন্নদান করবেন, এমন একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের চিহ্ন বহন করে বহু ঋক্। '(হে দেবতা) তুমিই গাভী ও অন্নের সত্য ও উৎপৃষ্ট দাতা— ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ।' (৫:২৩:২) 'শতক্রতু ইন্দ্র, প্রচুর ও মহৎ ধনের দাতা— উরোষ্ট ইন্দ্র রাধসঃ বিভ্বী রাতিঃ শতক্রতো।' (৫:৩৮:১) এই ধনের মধ্যে অনুক্ত হলেও অন্নও আছে। 'তিনি প্রচুর অন্নলাভের জন্যে তোমাদের বিশেষ ভাবে রক্ষা করুন— প্রাবন্তু বস্তুজয়ে বাজসাতয়ে'; (৫:৪৬) 'ইন্দ্র এবং অগ্নি এক সঙ্গে বৃত্রনিধন করে অন্ন দান করুন— শ্নথদ্বৃত্রমুত সনোতি বাজমিন্দ্রা বো অগ্নী সহুরী সপর্যাৎ।' (৬:৬০:১) 'গাভী প্রমুখ অন্ন দান করুন উষা— উষং গোৎগ্রান্ উপমাসি বাজান্'; (১.৯২.৭) 'উষাগুলি অন্ন আনে, অয়ি অন্নবতি (উষা)— বাজপ্রসূতাঃ বাজিনীবতি'; (১.৯২:৮, ১১, ১৩, ১৫) 'উষা সৎ কাজের জন্যে, দানের জন্যে অন্ন বহন করে আনেন— ইষং বহতী সুকৃতে সুদানবে।' (১:৯২:৩)

অন্যান্য সূক্তে উষার একটি অনুষঙ্গ আছে: ভোর হলে পশুপালক পশুপাল নিয়ে গোঠে যায়, চাষি চাষ করতে মাঠে যায়। দুটো কাজই শেষ পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এ সব কাজে মানুষকে প্রবর্তনা দেন উষা, ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে তারা যেন নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদনের ভূমিকায় তৎপর হয়। উষা তাই গৌণ ভাবে খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। উষা তাই 'বাজিনীবতী' অর্থাৎ অন্নবতী, এবং তাই তাঁর স্তবে খাদ্যের উল্লেখ। 'ইন্দ্র অন্ন, বল ও শক্তির অধিপতি— স বাজস্য শবস্য শুষ্মিণস্পতিঃ।' (১:১৪৫:১) এখানে অন্ন, বল ও শক্তি পরপর উচ্চারিত। আগন্তুক আর্যরা এ দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে বল ও শক্তির গুণে: এ শক্তি আসবে কোথা থেকে? অন্ন থেকে, তাই অন্ন এত প্রয়োজনীয়। 'হে অশ্বিন্‌রা, যে সুরক্ষা দিয়ে স্তোতাকে অন্ন দিয়ে পালন কর সেই সুরক্ষা নিয়ে তোমরা এস— যাভির্বিপ্রং প্র ভরদ্বাজমাবতং তাভিরু ষ উতিভিরশ্বিনা গতম্।' (১:১১২:১৩) 'তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে, হে ইন্দ্র আমরা অন্নলাভ করব— ত্বোতা ইদিন্দ্র বাজমস্মন্।' (২:১১:১৬১) বারবারই দেখছি সুরক্ষার সঙ্গে অন্নের একটা সাযুজ্য ধ্বনিত হচ্ছে। এর কারণ একটা প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার মধ্যে আগন্তুক এবং জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব দৃঢ় করতে চাইলে প্রথম প্রয়োজন শক্তি, এবং যেহেতু অন্নই সেই শক্তি জোগায় তাই অন্নের জন্যে এত আর্ত আবেদন। 'ত্বষ্টা দেবগণ

ও দেবপত্নীগণের সঙ্গে অন্নে প্রীত হোন— মন্দস্ব জুজুষাণো অন্ধসঃ ত্বষ্টা দেবেভির্জনিভিঃ'; (২:৩৬:৩) 'ইন্দ্র অন্নকে উন্মোচিত করেছিলেন— অপাবৃণোদিষ ইন্দ্রঃ।' (১:১৩০:৩) অর্থাৎ দলপতি ইন্দ্রের পরাক্রমের ফলে দলের লোকেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্ন আর তাদের কাছে আবৃত বা দুষ্প্রাপ্য রইল না। 'ইন্দ্র, রক্ষাকামী আমরা তোমাদের সুরক্ষার দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি করব— স্যাম তে ত ইন্দ্র যে ত ঊতী অবসুব ঊর্জং বর্ধয়ন্ত।' (২:১:১৩) ওই একই ধরনের যোগসূত্র, সুরক্ষার সঙ্গে অন্নের, এখানেও দেখা যাচ্ছে।

দেবতারাই অন্ন দেন, কিন্তু সে-ও একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সেটি হল যজ্ঞ। মানুষ যজ্ঞে দেবতাদের স্তব করে; তাঁদের আকৃতি, বেশবাস, অস্ত্র, অলংকার, গুণ, শক্তি ও পূর্ববর্তী ভক্তদের তাঁরা কী কী দিয়েছেন তার তালিকা পেশ করে; তা ছাড়াও চরু, পুরোডাশ, সোম, সুরা ইত্যাদি হব্য উৎসর্গ করে— এই বিশ্বাসে যে, স্তবে ও হব্যে দেবতারা প্রীত হন, ফলে ভক্তের প্রতি অনুকূল হয়ে তার প্রার্থিত দ্রব্য তাকে দেন। কাজেই যজ্ঞই সেই প্রক্রিয়া যা দেবতাদের কাছে মানুষের প্রার্থনা পেশ করে, তাঁদের কাছ থেকে মানুষের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে আনে। 'সোমরস ছাঁকা হচ্ছে (সোমযোগে) অন্নলাভের জন্যে— পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ'; (৯:১৩:৩) 'দেবতা অন্ন ও পানীয় দান কোরো— রাস্ব বাজমুত বংস্ব'; (৬:৪৮:৪)— বলা হচ্ছে যজ্ঞের প্রসঙ্গে। 'অন্নের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছি— অন্নং যজেব'; (২:২৪:১২) '(দেবতা) হব্য আস্বাদন কর ও অন্ন দান কর— স্বদস্ব হব্যা সমিষা দিদীহি'; (২:২২:১১, ৯:৩১:২) যজ্ঞ কিসের জন্য করছি? 'অন্ন লাভের জন্যে এবং ধনলাভের জন্যে— বাজস্য সাতৌ পরমস্য রায়ঃ'; (৭:৬০:১১ (যজ্ঞে) পূষা আমাদের (জন্যে) প্রচুর অন্ন ও রথ রক্ষা করুন; আমাদের স্তব শুনুন ও (আমাদের) অন্নের বৃদ্ধি সাধন করুন— অস্মাকমূর্জা পূষা অবিষ্ট মাহিনঃ। ভুবদ্বাজানাং বৃধ ইমং ন শৃণবদ্ধবম্'; (৯:২৬:৯) 'আমরা অন্ন ও ঋক্‌গুলি দিয়ে অন্ন ধারণ করছি— দধামন্নৈঃ পরি বন্দ ঋগ্‌ভিঃ।' (৩:৩৫:১২)

এখানেও যজ্ঞের উপকরণগুলিকে অন্নের উৎপাদক হিসাবে দেখানো হয়েছে:

> 'এই তিনি বহু অন্নযুক্ত যজ্ঞে খাদ্য উৎপাদন করছেন— এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ।' (৯:৪:১০) যজ্ঞে 'স্তোতাদের দ্বারা অন্ন ও গাভী (আনতে) যাচ্ছেন— স হি জরিতৃভ্য আ বাজং গোমন্তমবতি।' (৯:২৬:৯) 'সেই (দেবতার) যজনা কর (যিনি দেবেন) কাম্যবস্তু, সকল মানুষের স্তুতির ফলে সঞ্জাত অন্ন— স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতী বিশ্বজন্যাঃ।' (৯:১:৬)

মানুষের প্রয়োজন ও প্রার্থনা এবং দেবতাদের অনুগ্রহ— এর মধ্যে সেতুরচনা করে, যজ্ঞ মানুষের হবির্দান ও স্তুতি বহন করে দেবতাদের কাছে নিয়ে যায়, যাতে তাঁরা করুণাপরবশ হয়ে ক্ষুধিতকে খাদ্য দান করেন। যজ্ঞ, যা আদিমতম ধর্মানুষ্ঠান, তার একটা প্রধান ভিত্তিই হল অন্নের ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব। বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রার্থনা যেহেতু অন্নের জন্যেই, তাই সহজেই বোঝা যায়, এই প্রাথমিক প্রয়োজনই ছিল যজ্ঞকর্মের মূল প্রবর্তনা।

আবার মানুষ, ইন্দ্র ও বরুণের কাছে এমন প্রার্থনাও করছে যাতে সেই মানুষ নিজেও অন্ন দান করতে পারে (ভূয়াসং বাজদান্নাম্ ১:১৭:৪), কারণ, অন্নের অভাব সমাজে পরিব্যাপ্ত; খুব ছোট একটি অংশই প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট অন্নের সংস্থান করতে পারত; বাকিরা অন্নাভাবে কষ্ট পেত। স্বভাবতই কিছু মানুষ সেই কষ্ট দেখে তা মোচন করতে উৎসুক হত। তা ছাড়া অন্নহীন সমাজে অন্নদান করার মধ্যে একটা গৌরব আছে। সমাজে প্রতিপত্তি লাভেরও এটা একটা নিশ্চিত পন্থা। তাই অন্ন দান করার মর্যাদা অর্জন করবার জন্যে এই প্রার্থনা। যাদের অন্নের প্রাচুর্য ছিল তারা সকলেই কিন্তু অন্যের অভাব মোচনে তৎপর ছিল না। এখনকার মতো তখনও বিস্তর লোক প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কৃপণ ছিল। দান করে অন্নভাণ্ডার ক্ষয় করার মতো পরার্থপরতা খুব কম লোকেরই ছিল:

> 'যে দান করে সে ভোজক; অন্নকামী প্রার্থী, যে (অনাহারে) হাঁটতে হাঁটতে রোগা হয়ে গেছে তাকে দান করা ঐশ্বর্যবানের লক্ষণ— স ইদ্ভোজো যে গৃহবে দদাত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।' (১০:১১৭:৩) 'যে অন্ন ভিক্ষা করে, সহানুভূতি-প্রার্থী যে ব্যক্তিকে (অন্ন) দান করে না, সে বন্ধু নয়— ন স সখা যো ন দদাতি তস্মৈ সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।' (১০:১১৭:৪) 'প্রচুর অন্নের মালিক যে ব্যক্তি ঘুরে বেড়ানো দারিদ্র্যপীড়িত যাচকের প্রতি মন কঠিন করে, অন্ন দিয়ে তার সেবা করে না, উত্তরকালে সে কোনও সাহায্যকারী পাবে না— যে আধ্রয়ে চরমাণায় পিত্বোৎন্নবান্ সন্ রফিতায়োপ জগ্মুষে। স্থিরং মনঃ কৃণুতে ন সেবতে পুরোতো চিৎ স মর্ডিতায়োপজগ্মুকে রং না বিন্দতে।' (১০:১১৭:২)

'যে মানুষটা মর্মান্তিক দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হয়ে মনমরা হয়ে গুমরে রয়েছে তাকে কখনও বিদ্রুপ কোরো না; একে (দারিদ্র্যকে) অমর দেবতারাই পাঠিয়েছেন।'[৪] হেসিয়ড এখানে বলতে চান দেবতাদের ইচ্ছাক্রমেই মানুষ দরিদ্র হয়, অতএব বিধাতার বিধানে যে ব্যক্তি দরিদ্র তার দারিদ্র্য তো তার দোষে ঘটেনি। অতএব, তাকে নিয়ে শ্লেষ বিদ্রূপ করা ঠিক নয়। 'কোনও কিছুর প্রয়োজন থাকলেও সেটা না জোটাতে পারলে হৃদয় বিষণ্ন হয়।'[৫] এই অভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ তো অন্নাভাব, এবং অন্নার্থী সব সময়ে অন্ন ভিক্ষা করেও পেত না। এমন অভাবগ্রস্তের চিত্র আক্কাদীয় সাহিত্যে পাই। 'উপবাসে আমার চেহারা (বিকৃত হয়েছে), আমার মাংস ঝুলে পড়েছে, আমার রক্ত (শেষ হয়ে যাচ্ছে), আমার হাড় ভেঙে গেছে। আমার পেশীগুলো (ব্যাধিতে) ফুলে উঠেছে...।'[৬] এই উপবাসের চেহারা পৃথিবীর সর্বত্রই এক। এ হল অন্নাভাবের আদি ও অকৃত্রিম চেহারা।

৪. **'Never dare to taunt a man with deadly poverty who eats out the heart; it is sent by the deathless gods.' Hesiod: *Works and Days Loeb. II.* 717-18**

৫. **'...it grives the heart to need something and not to have it. *ibid II.* 368-69)**

৬. **'Through starving my appearance. ...my flesh is flaccid, my blood is (going) my bones are smashed... my muscles are inflamed.' 'Akkadian Observation on life and world order' in *Near Eastern Texts pp.* 25-27**

অন্নপ্রার্থীকে বিমুখ করা তখন সমাজে গর্হিত বলে গণ্য হত। এর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকাশ যে মন্ত্রটিতে তা হল, 'কৃপণ বৃথা অন্ন ভোজন করে, সত্য বলছি, তার বিনাশই ঘটে। সে অর্যমা (দেবতা)কে পুষ্ট করে না, বন্ধুকেও করে না; যে একাকী (নিজের) অন্ন ভোজন করে, তার পাপ তার একারই হয়— মোঘমন্নং বিন্দতে প্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কিবলাদী।' (১০:১১৮:৬) এই মন্ত্রে কৃপণের প্রতি ধিক্কারের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে সময়কার সমাজের কথা হচ্ছে তখন শুধু যে খাদ্য উৎপাদন পর্যাপ্ত ছিল না, তাই নয়, তখন যে দুর্ভাগ্য দরিদ্র খাবারের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে শীর্ণ শরীরে, তার একমাত্র ভরসা ছিল কোনও গৃহীর করুণা ও আতিথ্য।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গ্রিক লেখক হেসিয়ড্ বলেন, 'মানুষের জন্যে বিধাতার নির্দেশিত কাজ কর যাতে মনের প্রচণ্ড গ্লানিতে তুমি ও তোমার স্ত্রী-পুত্র কোনও প্রতিবেশীর কাছে জীবিকার জন্যে প্রার্থী না হও ও সে তোমাকে বিমুখ না করে।'[৭]

সমাজে অল্প কিছু লোকের প্রাচুর্য ছিল; খাদ্য-ভিক্ষু আশায় বুক বেঁধে তার কাছে প্রার্থী হত উদরপূর্তির জন্যে। এই প্রার্থিত আতিথ্য কিন্তু তখন তার শেষ ভরসাস্থল, সেখানে গৃহস্বামী বিমুখ হলে তখনকার সমাজব্যবস্থায় তার ক্ষুধা নিবারণের আর কোনও বিকল্পই ছিল না। এখনকার মতো খাবারের দোকান বা হোটেল ছিল না, থাকলেও ওই হতদরিদ্রের সঙ্গতি ছিল না দাম দিয়ে খাবার কেনার। তাই এই ধিক্কার। অর্যমা আর্যদের গোষ্ঠীগত মর্যাদার ও আর্যত্বের প্রতিনিধিস্থানীয় দেবতা। কৃপণ ব্যক্তি অর্যমাকেও প্রকারান্তরে বিমুখ করে, মানুষ সখাকেও। অতএব দেবতাদের মধ্যে কোনও সাহায্যকারী সে পায় না, তাই তার সম্বন্ধে মন্ত্রটি বিধান দিচ্ছে মৃত্যুর। কারণ যে-কৃপণ অন্নের ভাগ কাউকে না দিয়ে একা খায় তার পাপের বোঝাও সে একাই বহন করে। দেবতার হয়ে সমস্ত সমাজ ধিক্কার দিচ্ছে অন্নদানে বিমুখ ধনীকে। কেন? কারণ তখন সত্যিই বহু দুঃস্থ মানুষেরই অন্নসংস্থান ছিল না। অন্নভিক্ষাই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

যে-অন্নদানে কৃপণ তারও আতঙ্কের হয়তো কিছু হেতু ছিল। প্রকৃতির ওপরে তখন মানুষের এতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল না যে খাদ্য সম্বন্ধে মানুষ নিশ্চিত থাকতে পারে। খাদ্য সঞ্চয় করার মতো উন্নত বিজ্ঞান ছিল আয়ত্তের বাইরে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হত মাঝেমাঝেই। শত্রুরা লুঠ করত খাদ্য। স্বভাবতই মানুষ যা পারত ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রাখত। সবটা তার শুধু কৃপণতা নয়, অনিশ্চয় এবং নানা বিপর্যয়ের জন্যে অভাবের সম্ভাবনাও তাকে সন্ত্রস্ত রাখত। তাই অভাবে এবং স্বভাবে মানুষ মাঝে মাঝে কার্পণ্য দেখাত।

৭. 'Work the works which the gods ordained for men, lest in bitter anguish of spirit you with your wife and children seek your livelihood amongst your neighbours and they do not heed.' Hessiod, *Works and Day. II.* 398-99

এতক্ষণ ঋগ্বেদ সংহিতার কথাই হচ্ছিল। এর দশটি মণ্ডলের শেষেরটি যখন রচনা হয় সম্ভবত সেই সময়েই যজুর্বেদ সংহিতা রচনাও চলছিল। অথর্ব সংহিতার কিছু অংশ ঋক্‌সংহিতার চেয়েও প্রাচীন আবার কিছু অংশ ঋক্ ও যজুর্বেদের পরের রচনা। যজুর্বেদের প্রধান সংহিতা তৈত্তিরীয়তে যে সমাজ চিত্রটি পাই তাই আর্য-প্রাগার্য মিশ্রণের চিহ্ন বহন করে। এ মিশ্রণ গোষ্ঠীগত ভাবে অন্তর্বিবাহের দ্বারা সাধিত; এর প্রতিভাস পাওয়া যায় এর সাংস্কৃতিক অধিসংগঠনে। সংস্কৃতির একটা অংশ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণে প্রতিফলিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় অনুষ্ঠানের কিছু নির্দেশের সঙ্গে যজ্ঞকালে যে পাঠ করতে হবে তাও আছে। এই মন্ত্রগুলিই আমাদের এই সমাজের অবস্থা জানবার একমাত্র সূত্র। এখানেও দেখি ক্ষুধার প্রকোপ সমান ভাবেই আছে। দেবতাকে বলা হচ্ছে, 'তুমিই অন্নের সত্য ও আশ্চর্য দাতা, যে অন্নের সঙ্গে আছে গাভী, বলদ, বশা গাভী— ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতে উক্ষান্নায়, বশান্নায়...।' (তৈত্তিরীয় সংহিতা; ১:৩:১৪:৭) অন্যত্র শুনি, 'অগ্নি, আমাদের আয়ুকে পবিত্র কর, খাদ্য অন্ন উৎপাদন কর— অগ্নে আয়ুংষি পবস্ব আ সুবোর্জমিষং চ নঃ।' (তৈ/সং; ১:৩:১৪:৮; ১:৬:৬:২) প্রায় সমকালীন অথর্ব সংহিতায় শুনি, 'লোকজয়কারী, স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় এই যে প্রচুর অন্ন, (দেবতা তুমি) একে ব্রাহ্মণের জন্যে নিহিত রেখেছ— ইমমোদনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু বিষ্টারিতং লোকজিতং স্বর্গম্।' (অথর্ব সংহিতা; ৪:৩৪:৪)

খাদ্যে অগ্রাধিকার ব্রাহ্মণেরই। যে সমাজে ক্ষুধা ব্যাপক এবং ক্ষুধিতের অধিকাংশ অব্রাহ্মণ, তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ, সেখানে অন্নকে মুষ্টিমেয় অনুৎপাদক মানুষের অধিকারে রক্ষা করা অমানবিক। কিংবা খাদ্যকেই উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, 'এস খাদ্য, এস অন্ন, সত্য এস, সুরক্ষা এস— উর্জ এহি স্বধ এহি সুনৃত এহীরাবত্যেহীতি।' (অ/সং; ৮:১০:৪) আগেই দেখেছি পর্যাপ্ত খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিধান করে এবং সুরক্ষা শক্তিমানের কাছে সহজলভ্য। ভক্ত প্রার্থনা করছে, বৈশ্বানরের (অগ্নির) মহৎ মহিমা যে অন্ন তা আমাদের (পক্ষে) শুভ এবং মধুময় হোক— বৈশ্বানরস্য মহতো মহিমা শিবং মহ্যং মধুমদস্ত্বন্নম্।' (অ/সং; ৬:৭:৩) এ অন্ন এক প্রজন্মের জন্যে হলে আশ্বাস যথেষ্ট হয় না। পরবর্তী প্রজন্মও যেন অন্নাভাবে কষ্ট না পায় সে প্রার্থনাও শুনি। যজ্ঞকালে 'পুত্রের নাম নেয়, (এর দ্বারা) তাকেও অন্নের ভোক্তা করে— পুত্রস্য নাম গৃহ্ণাতি অন্নাদ্যমেবৈনং করোতি।' (তৈ/সং; ১:৫:৮:৫) শুধু পুত্র নয়, পরবর্তী দ্বাদশ পুরুষ যেন অন্ন ভোজন করে, সে ব্যবস্থাও যজ্ঞের দ্বারা নিশ্চিত করে তুলতে চেয়েছে মানুষ— সযোন্যেবান্নমব রুন্ধে দ্বাদশাৎ পুরুষাদন্নমত্তি।' (তৈ/সং; ২:৬:২:৩)

অন্ন যথেষ্ট ছিল না বলেই সমাজে সে সম্বন্ধে নানা কুসংস্কারও দেখা গিয়েছিল। এখনও আমরা যেমন চাল না থাকলে সরাসরি তা বলি না, বলি 'চাল বাড়ন্ত', ঠিক তেমনই অথর্ব সংহিতায় শুনি, 'যে অন্নের মহিমা জানবে সে (অন্নের সম্বন্ধে) বলবে না 'অল্প' বা 'ব্যঞ্জন নেই', 'নেই' (বলবে না), 'এটা নেই' (বলবে না), বা 'কী?' (বলবে না)— স য ওদনস্য মহিমানং বিদ্যাৎ নাল্প ইতি ব্রায়ান্নানুপসেচন ইতি নেদমিতি চ কিং চেতি।' (অ/সং;

১১:৩:২৩-২৪) স্পষ্টতই এমন একটা সংস্কার প্রচলিত ছিল যে অন্ন সম্বন্ধে এ জাতীয় নালিশ করলে কোনও দেবতা কোথাও রুষ্ট হবেন, আর অন্নদান করতে চাইবেন না। অন্ন কি সামান্য কোনও বস্তু? 'এই অন্ন থেকেই প্রজাপতি তেত্রিশ 'লোক' সৃষ্টি করেছিলেন— এতস্মাদা ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতং লোকং নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।' (অ/সং; ১১:৩:৫২) 'জল নিয়ে দম্পতী তণ্ডুল থেকে অন্ন পাক করেন— তা ওদনং দম্পতিভ্যাং প্রশিষ্টা আপঃ শিক্ষন্তী পচতা সুনাথাঃ।' (ওই, ১২:৩:৫২) অন্নের মাহাত্ম্য স্পষ্ট উচ্চারণ পেয়েছে: 'এই অন্ন ভোগ করেই দীর্ঘকাল উদীয়মান সূর্যকে দেখব— ইহেড়য়া সধমাদং মদন্তো জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্।' (অ/সং; ৬:৬২:৩) এই হল বৈদিক যুগের প্রথমার্ধের অন্তর্নিহিত গভীর বাসনা: মোক্ষ নয়, পুনর্জন্ম নয়, এই জন্মে এই পৃথিবীতেই যত দিন সম্ভব বাস করে উদীয়মান সূর্যের দর্শন পাওয়া এবং এই দীর্ঘ জীবনকে সুনিশ্চিত করতে পারে একমাত্র যথেষ্ট অন্নলাভের নিশ্চিত আশ্বাস। স্পষ্টই বোঝা যায় এ আশ্বাস মিলছিল না; সব মানুষের জন্যে যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন হচ্ছিল না; তাই এই কামনা এতবার উচ্চারিত।

ভক্তের প্রার্থনা যেন অন্ন ভোজন করতে পারি। 'অগ্নি, আমি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞকর্মের দ্বারা (লব্ধ) অন্নে যেন অন্নভোজী হই— অগ্নেরহং দেবযজ্যায়ান্নাদন্নাদো ভূয়াসম্।' (তৈ/সং; ১:৬:১১:৫) অথর্ব বেদের বিখ্যাত ভূমিসূক্তে পড়ি 'হে ভূমি, বল ও পুষ্টি যুক্ত অন্নের ভাগ ও ঘৃত (যেন পাই)— ঊর্জং পুষ্টং বিভ্রতীমন্নভাগং ঘৃতম্...।' (অ/সং; ১২:১:২৯) অন্নের ওপরে মানুষের প্রাণ নির্ভর করে বলেই বলা হয়েছে 'অন্নই প্রজা'— অন্নং বিট্।' (তৈ/সং; ৩:৫:৭:২) এ অন্নের কি কম মাহাত্ম্য? 'ঋতের প্রথম সন্তান ওদন, প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা একে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন— য মোদনং প্রথমজা ঋতস্য প্রজাপতিস্তপসা ব্রহ্মণ্যপচৎ।' (অ/সং; ৪:৩৫:১) রুদ্রদের মায়ের নাম পৃশ্নি, সেই 'পৃশ্নিই অন্নের রূপ'— পৃশ্নির্ভবত্যেতদ্বা অন্নস্য রূপম্।' (তৈ/স; ২:১:৭:৫) বিরাট একটি ছন্দের নাম যার তাৎপর্য যজ্ঞে বারবার উল্লিখিত হয়েছে এবং বহুবার একথা বলা হয়েছে যে এই 'দশ-অক্ষর-যুক্ত বিরাটই অন্ন— বিরাডন্নং বিরাজি এব অন্নাদ্যে প্রতিষ্ঠতি।' (তৈ/সং; ৫:৪:৬:৩) দশাক্ষরা বিরাডন্নম্ (তৈ/সং; ৩:৩:৫:৫; ৬:১:৯:৬; ৬:৬:৪:৫; ৭:৩:৭:৪; ৭:৪:২:১; ৭:৪:৪:৩; ৭:৫:৮:৩; ৭:৫:১৫:২)

এতগুলি মন্ত্রে অন্ন ও বিরাট্ এর সমীকরণ অন্নের গুরুত্ব বোঝায়— বৈশ্বানর (অগ্নি)-র মহান মহিমায় অন্ন আমার পক্ষে শুভ ও মধুময় হোক— বৈশ্বানরস্য মহতো মহিম্না, শিবং মহ্যং মধুমদস্ত্বন্নম।' (অ/সং; ৬:৭:৩) অন্নকে দেবতাদের সঙ্গে সমীকৃত করে বলা হয়েছে, 'অন্নই আদিত্য, অন্নই মরুদ্‌গণ— অন্নং বা আদিত্যান্নং মরুতঃ।' (তৈ/সং; ৫:৩:৪:৩) 'অন্নই অগ্নি— অন্নং বৈ পাবকঃ।' (তৈ/সং; ৫:৪:৬:৩) 'অন্নই সকল দেবতার সমাহার— বৈশ্বদেবং বা অন্নম্।' (তৈ/সং; ৬:৬:৫:৩) অন্নের স্বরূপ কী ছিল তার একটা আভাস মেলে যখন শুনি 'অন্ন হল যব— অন্নং বৈ যাবা।' (তৈ/সং; ৫:৩:৪:৫) অর্থাৎ আর্যরা তখন যবই উৎপাদন করছে এবং সেটাই প্রধান খাদ্যশস্য। আর দুধ তো পশুপালক আর্যদের, দীর্ঘদিনের

খাদ্য ছিলই। এখন তারা শস্য মিশিয়ে পায়স করতে শিখেছে, সে পায়স হয়ে উঠেছে খাদ্য— মানুষের, অতএব দেবতারও। চরু নৈবেদ্য দেওয়া হত যজ্ঞে, 'এ-ই হল সাক্ষাৎ অন্ন যা চরু, চরু দিয়ে অন্নকে অধিকার করে রাখে— এতৎ খলু বৈ সাক্ষাদন্নং যদেষ চরুর্যদেতং চরুমুপদধাতি সাক্ষাদেবাস্মা অন্নমব রুন্ধে।' (তৈ/সং; ৫:৬:২:৫) এ ছাড়া ভাতের কথাও শুনি, 'এই যে ওদন, সর্বাঙ্গ, সর্বপূরক, পূর্ণাঙ্গ, যে এ কথা জানে সে-ও সর্বাঙ্গ ও পূর্ণাঙ্গ হয়— এষ বা ওদনঃ সর্বপরুঃ সর্বতনুঃ। সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সং ভবতি য এবং বেদ।' (অ/সং; ১১:৩:৩১) 'যে অন্ন ভক্ষণ করি, বহুরূপ বহু বিচিত্র সুবর্ণ, অশ্ব, গাভী অথবা অজ, মেষ— এর যা কিছুই গ্রহণ করি অগ্নি তার হোতা হয়ে, তাকে সুষ্ঠু হবন করুন— যদন্নমদ্মি বহুধা, বিরূপং হিরণ্যমশ্বমু গামজামবিম্। যদেব কিঞ্চ প্রতিজগ্রাহমগ্নিশুদ্ধোতা সুহুতং কৃণোতু।' (অ/সং; ৬:৭১:১)

অন্নকে দেবতারূপে দেখার মধ্যেও এর মহার্ঘতা ও দুষ্প্রাপ্যতা এ দুইয়েরই অনুষঙ্গ আছে, আর আছে এর পবিত্রতার বোধ। আর পাঁচটা প্রয়োজনীয় বস্তুর থেকে অন্ন স্বতন্ত্র। শুধু বহুমূল্য নয়, এটা দেবতার অনুগ্রহের দান, এতে এর মহিমা যেন প্রকাশিত হচ্ছে, এর স্বরূপই হল দেবতা। এর পুষ্টি ও শক্তি দেওয়ার ক্ষমতাও একে অন্য এক মর্যাদা দিয়েছে। ইতিহাসের সেই পর্বে আগন্তুক জনগোষ্ঠী যদি পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে চায় তবে শক্তির উৎস তার কাছে প্রায় উপাস্য হয়ে দেখা দেবেই। অন্নকে শক্তিস্বরূপ ভেবে নানা ভাবে তার মহিমা কীর্তন করেছে মানুষ।

সে যুগে নিরাপত্তার সঙ্গেই যুক্ত ছিল খাদ্যসংস্থানের সমস্যা। তাই সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ছিল ক্ষুধাতৃষ্ণার আতঙ্ক। আগেই দেখেছি বামদেব ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছিলেন। এই ক্ষুধা তাড়া করে ফিরেছে বহু নিরুপায়, বিত্তহীন, অন্নহীন দরিদ্রকে। তাদের মনে হয়েছে 'ক্ষুধাই শত্রু, যে এ কথা জানে সে ক্ষুধা রূপ শত্রুকে হনন করে— ক্ষুৎ খলু ভ্রাতৃব্যং য এবং বেদ হন্তি ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যম।' (তৈ/সং; ২:৪:১২:৫) সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনও মতে খাদ্য সংগ্রহ বা অর্জন করবার। যখন তার ক্ষুধা বিনাশের চেষ্টা সার্থক হয়, তখনই সে ক্ষুধা-শত্রুকে হনন করতে পারে। মানুষ যখন বলে 'খাদ্য অন্ন আমি গ্রহণ করছি, তখন খাদ্য ও অন্নের দিক্ অবরুদ্ধ করে। সেই দিকে যে থাকে সে ক্ষুধিত হয়— ইষমূর্জমহমা দদে ইতীষমেবোর্জং তস্মৈ দিশোৎব রুন্ধে ক্ষোধুকা ভবতি যস্তস্যাং দিশি ভবতি।' (তৈ/সং, ৫:২:৫:৬) অন্ন দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথাও শুনি, 'লোকধারণের নাভিমূল এই ওদন। তার দ্বারা মৃত্যুকে উত্তরণ করব— যো লোকানাং নাভিরেষা তেনৌদনেন তরামি মৃত্যুম্।' (অ/সং; ৪:৩৫ সূক্তটির ১-৬ মন্ত্রের ধ্রুবপদ এই বাক্যটিই)। এর চেয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ কমই আছে: অন্ন দিয়েই মৃত্যুকে তরণ করা যায়। অর্থাৎ অন্নাভাবই মৃত্যু, খাদ্যই জীবন। 'সংবৎসরের দ্বারা ঐ ব্যক্তি "অন্ন আমার, অক্ষুধা আমার" এই কথা বলে অন্নকে বেঁধে রাখে, এই হল অন্নের রূপ— সংবৎসরেণৈবাস্মা অন্নমব রুন্ধেঽন্নং ম্যেক্ষুচ্চা ম ইত্যাহৈতদ্বা অন্নস্য রূপম্।' (তৈ/সং; ৫:৪:৮:২) 'সে বন্ধুসমেত প্রজাদের অন্ন ও

অন্নভোজনকে অভ্যুদিত করে, সে-ই বন্ধুসমেত প্রজাদের ও অন্নভোজনের প্রিয় আশ্রয় হয় যে এ কথা বোঝে— স বিশঃ সবন্ধুনন্নমন্নাদ্যমভ্যুদতিষ্ঠং। বিশী চ বৈ সবন্ধুনাং চান্নাদ্যস্য চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ।' (অ/সং; ১৫:৮:২,৩) অন্নভোজন এমন একটা ব্যাপার যার নিশ্চয়তা নেই বলেই কেউ যখন বহুজনের, বন্ধুসমেত প্রজাদের জন্য খাদ্যসংস্থান করে তখন সে বহুলোকের প্রিয় আশ্রয় হয়। অন্নদাতা ত প্রকারান্তরে জীবনদাতা-ই। তাই অন্নদাতার প্রশংসার অন্তর্নিহিত থাকে জীবনরক্ষার আশ্বাসের প্রশংসা।

'ঋতু ছ'টি, প্রজাপতির দ্বারা এ ব্যক্তির অন্নভোজন গ্রহণ করে ঋতুরা, তারপরে ওকে তা দান করে— ষট্ বা ঋতবঃ প্রজাপতিনৈবাস্যান্নাদ্যমাদায়ার্তবো অস্মা অনু প্র যচ্ছন্তি।' (তৈ/সং; ৩:৪:৮:৬) ছয় ঋতু মানে সম্বৎসর। উৎপাদন ব্যবস্থা এমন স্তরে ছিল না যে সাধারণ মানুষের সারা বছর খাবার জোটবার কোনও আশ্বাস ছিল, তাই মানুষ ভেবেছিল প্রজাপতি, যিনি ফসলের ও প্রজননের অধিদেবতা, তাঁর কাছে থেকে ঋতুরা যদি খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মানুষকে তা দান করে তা হলে অনাহারের আতঙ্ক কিছু কমে। 'হে অন্নপতি, আমাদের অন্ন দাও ...অগ্নিই হলেন অন্নপতি, তিনিই একে অন্ন দান করেন— অন্নপতে অন্নস্য নো দেহীত্যগ্নির্বা অন্নপতি স এবাস্মা অন্নং প্রথস্থতি।' (তৈ/সং; ৫:২:২:১) বারবারই দেখছি অন্ন কোনও দেবতার দান বলে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বোঝা সহজ, এর মূলে ছিল অন্নের অপ্রাচুর্য, ফলে যখন কারও আহারের সংস্থান ঘটে, তখন সে খাদ্যকে দেবতার দান বলেই সাদরে গ্রহণ করে। একটা কারণ, উৎপাদন ব্যবস্থা এতটা অগ্রসর ছিল না যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারত। ফসল ফলাবার সমস্ত চেষ্টাই মাঝে মাঝে ব্যাহত হত, ফলে মানুষের নিজের শক্তির ও তার প্রয়াসের সাফল্যের ওপরে আস্থা রাখা সম্ভব ছিল না। যারা অন্নের বিষয়ে জানত সেই আমাদের কৃষকদল বিদ্যা দ্বারা (ভূমি) খনন করে যা উৎপাদন করেছিল, 'হে অগ্নি, সেই হব্য রাজা বিবস্বানের উদ্দেশে যজ্ঞে হবন করছি, এ বার আমাদের যজ্ঞিয় অন্ন মধুময় হোক— যদ্ গ্রামং চক্রুর্নিখনন্ত অগ্নে কার্ষীকা অন্নবিদো ন বিদ্যয়া। বিবস্বতে রাজনি তজ্জুহোম্যথ যজ্ঞিয়ং মধুমদস্তু নোৎন্নম।' (অ/সং; ৬:১১৩:১) 'বল এবং সুবুদ্ধি সেখানে মরুদ্‌গণ প্রচুর ভাবে বর্ষণ করুন যেখানে মানুষের আছে, আমাদের দিকে (তাঁরা) মধু সিঞ্চন করুন— ঊর্জং চ তত্র সুমতিং চ পিন্বত যত্র নরো মরুতঃ সিঞ্চমা মধু।' (অ/সং; ৬:২২:২)

দেবতারা অন্নদান করলেও সেটা যজ্ঞের মারফৎ মানুষের কাছে পৌঁছয়। ধারণাটা এ রকম ছিল যে মানুষ হব্য দিয়ে দেবতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, বিনিময়ে তাঁরা মানুষকে যা যা দান করেন তার মধ্যে এক প্রধান দান হল খাদ্য। এই বিনিময়টা নিষ্পন্ন হয় যজ্ঞের মাধ্যমে, যে-যজ্ঞে মানুষ প্রথমে খাদ্য দিয়ে দেবতাকে আপ্যায়ন করে, খাদ্য ও অন্যান্য প্রার্থিত দ্রব্য লাভের আশায়:

> 'মানুষ পৃথিবীকে অন্নভোজনের (উদ্দেশ্যে) অনুকূল করতে পারেনি। পৃথিবী এই মন্ত্র দর্শন করেন; তখন তাঁকে (সে) অন্নভোজনের (উদ্দেশ্যে) অনুকূল করতে পারল— পৃথিবীমন্নাদ্যে

নোপানমৎ সেতং মন্ত্রমপশ্যত ততো বৈ তামন্নাদ্যমুপানমৎ।' (তৈ/সং ১:৫:৪:২) 'অন্নকামী ব্যক্তি (দেবতা) পূষার উদ্দেশে বলিকালে (ছাগ) হনন করুক, অন্নই পূষা। তাঁর নিজের ভাগ দিয়েই পূষার কাছে উপস্থিত হয়, তাঁরা একে অন্ন দান করেন; সে অন্নভোজক হয়— পৌষ্ণং শ্যামমালভেত অন্নকামঃ অন্নং বৈ পূষা; পূষণমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি ত এবাস্মা অন্নং প্রযস্থন্ত্যন্নাদ এব ভবতি।' (তৈ/সং ২:১:৬:১) 'যার জন্য (এ) অন্নভোজী হোক কামনা করবে, সেই হেতু রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে ত্রিধাতু (বলি) উৎসর্গ করবে— যং কাময়েত অন্নাদঃ স্যাদিতি তস্মাদেতং ত্রিধাতু নির্বপেৎ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে।' (তৈ/সং ২:৩:৬:১) 'অন্নকামী বিশ্বদেবের উদ্দেশে চিত্ররূপা (পশু) হনন করবে, বিশ্বদেবেরই অন্ন সমস্ত দেবতার উদ্দেশে নিজের অংশ নিয়ে উপস্থিত হয়; তাঁরা একে অন্ন দান করেন— বৈশ্বদেবীং বহুরূপামালভেত অন্নকামো বৈশ্বদেবং বা অন্নং বিশ্বানেব দেবান্ স্বেন ভাগধেয়েন ধাবতি এবাস্মা অন্নং প্র যচ্ছতি।' (তৈ/সং ২:১:৭:৫)

বিশ্বদেব বৈদিক সাহিত্যের প্রথম পর্বের শেষের দিকের একটি কল্পনা। সমস্ত দেবতার সমন্বিত দেবমণ্ডলীর একটি কল্পরূপ। এঁদের কাছে সমবেত ভাবে, আবার এঁদের মধ্যে কোনও কোনও দেবতাকে একক ভাবেও স্তব করে প্রার্থনা করা হত। যেমন, বরুণের জন্যে সোমরস যজ্ঞে দান করেও অন্নভোজী হওয়া গেল না:

সে এই কৃষ্ণবর্ণ বশা বরুণের (বিশিষ্ট) পশু বশা গাভী 'দেখতে পেল, সেই কৃষ্ণবর্ণা বশা গাভী হনন করল তার নিজস্ব দেবতার (বরুণের) উদ্দেশে; তখন (তার) অন্নভোজী হওয়ার জন্যে (বরুণ) অনুকূল হলেন— বরুণং সুষুবাণমন্নাদ্যং নোপানমৎ স এতাং বারুণীং কৃষ্ণাং বশামপশ্যৎ তাং স্বায়ৈ দেবতায়া আলভত ততো বৈ অন্নাদ্যমুপানমৎ।' (তৈ/সং ২:১:৯:১) 'দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই অন্নভোজী— অগ্নির্দেবানামন্নাদঃ।' (তৈ/সং ২:৬:৬:৫) 'আমি (যেন) অন্নবান্ হই' এই কামনা যে করে, সে অন্নবান অগ্নির উদ্দেশ্যে আটটি সরায় পুরোডাশ উৎসর্গ করবে— অগ্নয়ে অন্নবতে পুরোডাশমষ্টকপালং নির্বপেদ্ যঃ কাময়েদ্ অন্নবান্ স্যাম্।' (তৈ/স ২:২:৪:১, ওই কথাই অন্য ভাবে আছে তৈ/স ৩:৪:৪:৩) স্তুতিমাত্র ইন্দ্রের দ্বারা অন্নের আহার নিশ্চিত হয়।' (তৈ/সং ২:২:৭:২) 'যাদের বিষয়ে কামনা করবে যে সে অন্নবান হোক, এই নিমিত্ত রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে ত্রিধাতু যাগ অনুষ্ঠান করুক— যং কাময়েত অন্নাদঃ স্যাদিতি তস্মাদেতং ত্রিধাতুং নির্বপেৎ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে।' (তৈ/সং ২:৩:৬:১) 'বিরাজ ছন্দের মন্ত্রোচ্চারণযুক্ত যোগের দ্বারা অন্নকে অবরোধ করা যায়— বিরাজৈবান্নাদ্য মবরুন্ধে।' (তৈ/সং ২:৬:১:২) রথন্তর স্তোত্রের দ্বারাও অন্নভোজনকে অবরুদ্ধ (বা নিশ্চিত) করা যায়। (তৈ/সং ৫:৪:১১:২) কর্ম বা যজ্ঞের দ্বারা (দেবতাদের দ্বারা) অন্ন প্রেরিত হয় এমন কথাও শুনি। (তৈ/সং ৩:২:১১:১) 'অন্নকামী দ্রোণপাত্রে অন্নসঞ্চয় করবে, দ্রোণে অন্ন রাখা হয় (অতএব) উৎপত্তিস্থল-সমেত অন্নকে অবরোধ করা যায়।' (তৈ/সং ৫:৪:১১:২) 'যে অগ্নিচয়ন (যজ্ঞ) করে সে অন্ন ভোজন করে— অগ্নিং চিন্বানমত্ত্যন্নম্।' তৈ/সং

৫:৬:১০:২) 'মহাব্রত যাগ যে সম্পাদন করে সে অন্নভোজন(কে) নিশ্চিত করে— মহাব্রতবান্ অন্নাদ্যাস্যাবরুদ্ধ্যৈ।' (তৈ/সং ৭:২:২:২) 'যে দক্ষিণার পাঁচটি পাত্রে অন্ন ও ছাগ দান করে সে অন্ন, তেজ ও শক্তি দোহন (লাভ) করে— ইষং মহ উর্জমস্মৈ দুহে যো পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্জ্যোতিষং দদাতি।' (অ/সং ৯:৫:২৪)

উপরের মন্ত্রগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অন্নবান্ হওয়ার কামনা বৈদিক সমাজের একটি গভীর ও মৌলিক কামনা; এ কামনার ভিত্তি হল সার্বিক খাদ্যাভাব; এবং মানুষ আপন চেষ্টায় যেটুকু উৎপাদন করছে তাতে এই ব্যাপক ক্ষুধা বা খাদ্যাভাবের কোনও প্রতিকার করা যাচ্ছে না। ক্ষুধা সমাজে পরিব্যাপ্ত। মানুষ দেখছে লৌকিক প্রয়াসে এ ক্ষুধার সমাধান নেই, তাই সে দ্বারস্থ হচ্ছে দেবতাদের: জনে-জনে দেবতাদের ডেকে বলছে, অন্ন দাও, শস্য দাও, ক্ষুধা নিবারণ কর; ক্ষুধাতৃষ্ণাই মৃত্যু, এ মৃত্যু থেকে বাঁচাও আমাদের। বহু দেবতার কাছে, বিভিন্ন ভাষায়, বারংবার এই প্রার্থনায় ফুটে উঠেছে সমাজের সমবেত এক আর্তি।

মানুষ ক্ষুধায় জর্জর এবং প্রতিকারের কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, এই অবস্থায় দেবতাকেন্দ্রিক যজ্ঞনির্ভর সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেই। 'সমস্ত যজুর্বেদে তাই দেখি, আজ যা নিরর্থক যজ্ঞানুষ্ঠান বলে মনে হয় তারই একটি প্রকাণ্ড সমাবেশ, যেটির মধ্যে প্রতিফলিত রয়েছে একটি অন্তর্নিহিত অভাব; খাদ্য উৎপাদনের অ-পর্যাপ্ত ব্যবস্থার ফলে করুণ খাদ্যাভাব।'[৮] এই সময়ের যজুর্বেদের সাহিত্যে জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম একক সংজ্ঞা হল 'গ্রাম'; 'গ্রাম শব্দটির মুখ্য তাৎপর্য তখনও ছিল এক যাযাবর পশুচারী গোষ্ঠী।'[৯] পরে যজুর্বেদেরই অন্তর্ভুক্ত শতপথ ব্রাহ্মণে পড়ি 'শর্যাতো হ বা ইদং মানবো গ্রামেণ চচার' (৪:১:৫:২): শর্যাত গ্রাম, অর্থাৎ পশুচারী যাযাবর জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এই ভ্রাম্যমাণ পশুপালক দল কৃষিতে নিযুক্ত হওয়ার আগে কোথাও স্থিতিশীল হয়ে বসবাস করেনি; পশুপালের জন্যে চারণভূমি যেখানে তৃণশ্যামল, সেখানেই থাকত; খরায়, বন্যায় বা পশুপাল ঘাস খেয়ে যখন রুক্ষ করে ফেলত তৃণভূমিকে তখন দলবল এবং পশুপাল নিয়ে নূতনতর চারণভূমির সন্ধানে তাদের বেরিয়ে পড়তে হত। খাদ্য অর্জনের এই স্তরে মানুষ সম্পূর্ণত প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতি সদয় হলে, যথাকালে বর্ষণ হলে, আকস্মিক কোনও দুর্যোগ দেখা না দিলে তৃণভূমি পশুপালের এবং প্রকারান্তরে পশুপালকদেরও আহার জোগাত। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলেই পশু ও পালকের অবধারিত অনাহার ও মৃত্যু, যদি না তারা তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারত। এ অবস্থা খাদ্যের প্রাচুর্য সূচিত করে না। প্রাথমিক ভাবে

৮. 'The whole of the Taittirrya Samhita with its monstrous accretion of what now appears to be senseless ritual reflects a painful underlying necessity· shortage of food under the inadequate system of production.' Kosambi *An Introduction*...to the Study of Ancient Indian History.' p. 140

৯. 'The word grama had still the major connotation of a pastoral group on the move.' W Rall. *Staat und gesellschaft*. p. 51

যখন কাঠের ফলার লাঙলের চাষ এরা শিখল তখনও প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের জোগানে প্রচুর ঘাটতি ছিল, তাই বহু সংখ্যক দেবতার কাছে, খাদ্যের জন্যে বারংবার এত করুণ আকুতি, নানা ভাষায় এত প্রার্থনা। এবং নিত্যনূতন যজ্ঞ আবিষ্কার করে অনুষ্ঠান করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো, কিসে খাদ্য সংস্থান নিরাপদ ও পর্যাপ্ত হয়। যজুর্বেদের ক্রমবর্ধমান যজ্ঞের সংখ্যা, জটিলতা ও ব্যাপ্তির পশ্চাতে খাদ্যাভাবের পর্দাটাই বেশি করে চোখে পড়ে।

'অথর্ববেদের রচনার কিছু অংশ ঋগ্বেদেরও পূর্বের, আর কিছু অংশে যজুর্বেদ সংকলনেরও পরের, সেই জন্যে অথর্ববেদের সব শেষে উল্লেখ। এখানে খাদ্যের সংজ্ঞা এবং সে সম্বন্ধে প্রার্থনায় কিছু বৈচিত্র্য আছে: ব্রীহি, তণ্ডুল, ওদন, শারিশাকা শ্যামাক, মাষ, ইত্যাদি ধান্যবাচক নানা শস্যেরও নাম যেমন পাচ্ছি তেমনই খাদ্যের অপর অংশ দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাংসের জন্যে পশুপালের কুশল প্রার্থনা পাচ্ছি। (অ/সং ২:২৬; ৩:১৪; ৬:৫৯) এ সব পশু যেন হিংস্র শ্বাপদের ও দস্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় সে জন্যেও পশুপালকের প্রার্থনা পাই। (অ/সং ৪:৩) সহসা বজ্রপাতে শস্যের ক্ষতি যেন না হয় তার জন্যে (অ/সং ৭:১১) এবং কীটপতঙ্গ যেন ফসল না নষ্ট করতে পারে তার জন্যেও প্রার্থনা পাই। (অ/সং ৬:৫০) যা কিছু ক্ষুধার্ত মানুষের উদরপূর্তির উপকরণ জোগায় তার সংরক্ষণের জন্যে প্রার্থনা এখানে আছে। এ ধরনের প্রার্থনার অনুবৃত্তি পরবর্তী যুগেও আছে। আর্য আগন্তুকরা দক্ষিণ-পূর্বে এগোতে এগোতে বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে পৌঁছনোর কাছাকাছি সময়ে অথর্ববেদের কিছু অংশ রচিত হয়, তাই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের— যে যুগে সংহিতাগুলির শেষাংশের সমান্তরাল ভাবে ব্রাহ্মণগুলির প্রথমাংশ রচনা চলছিল— সেই সময়কার চিত্র বিধৃত আছে অথর্ববেদে।

অথর্ববেদের শেষ পর্যায়ের একটি রচনাতে দেখি যে তখন খাদ্যসম্ভারে কিছু বৈচিত্র্য এসেছে। কুন্তাপসূক্তে এক জায়গায় পড়ি: 'কোন্‌টা তোমার জন্যে আনব? দই, ঘোল না যবসুরা?' এই কথা স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, 'সেই রাজ্যে', যেখানে রাজা পরিক্ষিৎ রাজত্ব করেন— কতরত্ত আ হরামি দধি মন্থাং পরিস্রুতম্। জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ।' (অ/সং ২-:১২৮:৯) এত বিকল্পের অর্থ প্রতীকী সমৃদ্ধি। অর্থাৎ শুধু যে সমাজে কিছু বিত্ত এসেছে তা নয়, এ বিত্ত এসেছে অল্প কয়েকটি ভাগ্যবানের হাতে। রাজা পরিক্ষিতের রাষ্ট্রে ধনীরা ভাল খেত, তাদের ভাণ্ডারে নানা বিকল্প খাদ্য ছিল; পরিতৃপ্ত বধূ স্বামীকে তখন প্রশ্ন করতে পারে, 'কোনটা খাবে, বল?' অর্থাৎ শুধু উদরপূর্তির জন্যে বাধ্যতামূলক ভাবে যার যেটুকু জোটে তাই নয়, রুচির প্রশ্নও এসেছে সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী সাহিত্যে পরীক্ষিতের রাজ্যকালকে কলিযুগের সূত্রপাত হিসেবে দেখা হত, অর্থাৎ সে যুগে অন্তত কিছু লোকের ভাগ্যে খাদ্যের বেশ কিছু বিকল্প ও প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। বোঝা কঠিন নয়, এই কতিপয় ভাগ্যবানের বাইরে বৃহত্তর সমাজে অন্নের জন্যে হাহাকার অব্যাহতই ছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ও কিছু বিত্তশালী রাজন্য বা বণিক সারা দেশের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে না। শুধু প্রমাণ করে যে তখন শস্য উৎপাদনে কিছু বৈচিত্র্য এসেছিল।

খাদ্যাভাব ও যাগযজ্ঞ

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়, বা তার কিছু আগে থেকে উত্তর ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থায় গভীর এবং ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকেই এখানে প্রথম লোহার দেখা মেলে; তবে সে লোহা হয়তো অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, ঘোড়ার খুর, ইত্যাদিতে ব্যবহার হত। আরও তিন শতক পরে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষে ও সপ্তম শতকের প্রথমে দেখি কৃষিতে লোহার লাঙলের ফলার চল হল। আগে কাঠের ফাল ছিল লাঙলের মুখে, তাতে বহু পরিশ্রমে দীর্ঘ সময়ে স্বল্প জমিতে অগভীর 'সীতা' রেখাপাত। এর অনেক অসুবিধে ছিল; বীজ গভীরে না পড়ার ফলে পাখি ও কীট পতঙ্গ খেয়ে নিতে পারত; সবটা বীজে গাছ গজাত না। দ্বিতীয়ত, অনেক পরিশ্রমে অনেক সময়ে লাঙল দিয়ে যে চাষটুকু হত তার ফসলের পরিমাণ বরাবরই অ-পর্যাপ্ত হত, ক্ষুন্নিবারণের পক্ষে তা ছিল নেহাতই অপ্রচুর; ফলে সারা সমাজে পরিব্যাপ্ত ক্ষুধা মেটাবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন লোহার লাঙলের ফলা যেহেতু অনেক মজবুত তাই লাঙলের ফাল গভীর হল, বীজ গর্তে থাকল, পাখি বা কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলতে পারল না; গাছ জন্মাল বেশি। সবচেয়ে বড় কথা হল, অল্প সময়ে বেশি জমি চাষ করা গেল, ফলে ফসলের পরিমাণও হতে লাগল বেশি। এর সঙ্গে আরও কতকগুলো ব্যাপার যুক্ত হল, যেমন কম শ্রমে কম সময়ে বেশি জমি চষার সম্ভাবনা দেখা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে হালের বলদের প্রয়োজন বাড়ল। সে রকম সংখ্যার বলদ পশুপালে ছিল; কিন্তু তার অনেকগুলোই অন্য ভাবে খরচ হয়ে যাচ্ছিল যজ্ঞের পশুহননে। প্রত্যেকটি বড় যজ্ঞে শ'য়ে শ'য়ে পশুহননের বিধান ছিল। মনে রাখতে হবে, যাগ ছিল তিন রকমের: পশু, ইষ্টি ও সোম। এর মধ্যে শুধু ইষ্টিতেই পশুহনন হত না, বাকি দুটোতে হত এবং বহু সংখ্যায় হত। সমাজে সহজে বেশি শস্য-উৎপাদনের নতুন সম্ভাবনা দেখা দিতেই যজ্ঞে বহুসংখ্যক পশুহনন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, অকল্যাণকর বলে স্বীকার করতে হল। তাই শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, 'যে ধেনু ও ষাঁড়ের (মাংস) আহার করবে তার বিনাশ হবে... সে পাপী...।' অতএব ধেনু ও ষাঁড়ের মাংস খাবে না। যাজ্ঞবল্ক্য এ কথা বলছেন কিন্তু, এও বলছেন, 'আমি (কিন্তু) খাব যদি সুস্বাদ হয়— যা

ধেন্বনডুহোরশ্নীয়াদন্তগিতিরিব... পাপী... তস্মাদ্ধেন্বনডুহোর্নাশ্নীয়াত্তদু হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽশ্নামেবাহমংসলং চেদ্ভবতীতি।' (শ/ব্রা ৩:১:২:২১) অন্যত্র দেখি, 'এই হল শ্রেষ্ঠ আহার, এই মাংস তাই পশুবন্ধ যাগ করলে সে পরম অন্নের (অর্থাৎ মাংসের) ভোক্তা হয়— এতদু হ বৈ পরমমন্নাদ্যং যন্মাংসং স পরমস্যৈবান্নাদ্যাস্যাত্তা ভবতি।' (শ/ব্রা ১১:১:৬:১৯)

তখন অবশ্য গৃহপালিত পশুর অথবা শিকার করে বনের পশুর মাংস খাওয়া হত। 'দুরকম পশুই (যজ্ঞে) হনন করা হয়, গ্রামের ও অরণ্যের উভয় পশুকে অবরোধ করার জন্যে— উভয়ান্ পশূনালভতে গ্রাম্যাংশ্চারণ্যাংশ্চ উভয়েষামবরুদ্ধ্যৈ।' (তৈ/ব্রা ৩:৯:২২:৯) অর্থাৎ যজ্ঞে দু' রকম পশু হনন করে মাংস হব্য হিসেবে দেওয়া হত, যাতে দু' রকমের পশুমাংসই আহারের জন্যে অবরুদ্ধ বা নিশ্চিত হয়: যজ্ঞে যা দেওয়া হবে দেবতারা তাতে প্রসন্ন হয়ে মানুষের ভোগের জন্যেও তা দেবেন এই বিশ্বাস থেকে। কোনও এক রকমের মাংস থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় এই বিধান। কিন্তু গ্রামের পশু যজ্ঞে যদি অনেক সংখ্যায় হনন করা হয় তা হলে চাষের সেই মৌলিক সমস্যাটা থেকেই যায় অর্থাৎ হালের বলদে টান পড়ে। তাই এখনকার শাস্ত্রে এ সব নিষেধের অবতারণা।

এ ত হল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে গাভীবলদ সংরক্ষণের নির্দেশ, এবং মনে রাখতে হবে যে এ নির্দেশ আকস্মিক নয়: এ নীতি স্পষ্টতই যজ্ঞের শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করছে অর্থনীতির স্বার্থে; যজ্ঞে বহু সংখ্যক পশু হননের যে অনুজ্ঞা কয়েকশো বছর ধরে চালু ছিল তার বিরুদ্ধতা করছে। এ ছাড়াও তখন বুদ্ধের পূর্বে যে সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, যাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল প্রব্রজ্যার পথে যেমন আনাড় কলাম, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, রুদ্রক রামপুত্র, পূরণ কশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, সঞ্জয় বৈরাটীপুর— এঁরা সকলেই বেদবিরোধী এবং যজ্ঞবিরোধী, ফলে পশুহননের বিপক্ষে। এঁদের মধ্যে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেন। এই দুই ধর্মেরই একটি ভিত্তিপ্রস্থর হল অহিংসা, অর্থাৎ পশুহননের বিরোধিতা। বলা বাহুল্য, এ অহিংসার মূলে একটি আতঙ্ক: যজ্ঞে যদি ওই ভাবে শ'য়ে শ'য়ে পশুহত্যা চলতে থাকে তা হলে হালের বলদে টান পড়বে, ফলে যথেষ্ট চাষ হবে না। সম্ভবত টান তখনই পড়ছিল বলেই যজ্ঞবিরোধী, পশুহননবিরোধী, অহিংসার বাণী এত দ্রুত এত জনপ্রিয়তা পেল এবং যজ্ঞ ও পশুহত্যা ধীরে ধীরে কমে এল।

কাজেই লোহার লাঙলের ফলার সাহায্যে অল্প শ্রমে দ্রুত বেশি জমি চাষ করার কিছু কিছু সুফল সদ্যই পাওয়া গেল, প্রত্যাশার অতিরিক্ত। উদ্বৃত্ত ফসল। এ উদ্বৃত্তের অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। এর অর্থ আগে যে ক'জন মানুষ যতটা সময়ে যে কটা হালের বলদ দিয়ে, যতটা জমি চাষ করতে পারছিল এবং যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি পেতে শুরু করল।

এরই সঙ্গে আরও কতকগুলো ঘটনা সম্পৃক্ত। আর্যদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রাগার্য দূরে পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে সরে গিয়েছিল, তাদের ক্রমে ক্রমে দাস হিসেবে গ্রহণ করল আর্যসমাজ। লোহার লাঙলের ফলার কল্যাণে চাষেও কম মানুষ নিযুক্ত করা হচ্ছিল; কাজেই

এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হল কুটির শিল্পে; কাঠ, ধাতু, চামড়া, পাথর মাটি, রত্ন, সোনারুপো ও অন্যান্য ধাতু দিয়ে প্রয়োজনীয় ও সুদৃশ্য বস্তু নির্মাণ করবার কৃৎকৌশল আয়ত্ত ছিল প্রাগার্য জনগোষ্ঠীর। এ কয় শতাব্দীর মধ্যে তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু বিদ্যা আয়ত্ত করে নিল আগন্তুক— এবং তৎকালে মিশ্র জনগোষ্ঠী। কৃষির উদ্বৃত্ত এবং শিল্পে নির্মিত বস্তু দুই-ই রপ্তানিযোগ্য। প্রাগার্য যুগে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতকেরও পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের নৌবাণিজ্য ছিল; সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল মধ্যপ্রাচ্য, মিসর, চিন হয়ে দক্ষিণ ইয়োরোপ পর্যন্ত। আর্যরা আসবার অনতিকাল পরেই এ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। পুনর্বার চালু হয় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী নাগাদ। আমরা দেখলাম, এই সময়টাতেই শস্যে ও শিল্পে এখানে উদ্বৃত্ত সৃষ্ট হচ্ছিল, এ উদ্বৃত্ত এখন নৌবাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যে পরিণত হল। ফলে দূর বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন দ্রব্য এবং সোনারুপো যেমন আসতে লাগল, তেমনই ভারতবর্ষের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিও হতে লাগল।

এরই কিছু পরে উত্তর ভারতে মুদ্রার প্রচলন হয়। এর একটা তাৎক্ষণিক সুবিধে হল বণিক সার্থবাহের বহু দীর্ঘ দলগুলির সঙ্গে ক্ষত্রিয় রক্ষিবাহিনী দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে যেত। পূর্বের রেশমপথেই হোক বা এখনকার স্থলপথে কিংবা বণিক-নৌকার সহযাত্রী রক্ষা হিসেবেই হোক, এই রক্ষিবাহিনী থাকতেই হত। এখন তাদের মুদ্রায় বেতন দেওয়া সম্ভব হল। যে সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য, তারা এখানকার বণিকদের কবালা পাট্টার মতোই সম্মান করত সেই বণিকদের পাঠানো মুদ্রা। কাজেই বহির্বাণিজ্য এবং দূরস্থ প্রবেশগুলির মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যেও খুব কাজে লাগল সদ্য প্রচলিত মুদ্রার ব্যবস্থা।

কারা এই বাণিজ্যের কর্তা ছিল? রাজারা ও রাজন্যরা, অর্থাৎ সমাজের মুষ্টিমেয় একটি ধনিক গোষ্ঠী। এরা বাহুবলে এবং লোকবলে বেশি জমির মালিক হয়েছিল, ফলে প্রথমে আমদানি করা ও পরে স্থানীয় লোহা ব্যবহার করে লাঙলের ফলা তৈরি করে চাষিদের নিযুক্ত করে চাষের উদ্বৃত্ত ফসল এদেরই হাতে আসত এবং টাকার জোরে কুটিরশিল্পের উপাদান কাঠ, ধাতু, মণিরত্ন, ইত্যাদির জোগান দিয়ে শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করিয়ে দেশে রাজা-রাজন্যদের কাছে ও বিদেশের বণিকের কাছে তা বিক্রি করবার একচেটিয়া অধিকার ছিল সমাজের উপরতলার সেই মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়েরই। ক্ষত্রিয় যখন ইতস্তত ছোট ছোট যুদ্ধ ছাড়া অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে রক্ষী হিসাবে নিযুক্ত, বৈশ্য তখন পশুপালন ও চাষ করছে। কিছু ধনী বৈশ্য ও দরিদ্র শূদ্র তখন চাষে আসছে কারণ তত দিনে বাণিজ্যে ধীরে ধীরে বৈশ্যের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সময়টা খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি। তখন ক্ষত্রিয় রাজা ও রাজন্যর প্রসাদপুষ্ট কিছু ব্রাহ্মণ ভূসম্পত্তি, দাসদাসী ও পশুপাল দক্ষিণা হিসেবে পেয়ে, কেউ বা বহুসংখ্যক ছাত্রের অধ্যাপনার জন্যে 'কুলপতি' হয়ে বেশ ধনী ব্রাহ্মণের মর্যাদায় ছিলেন। শাস্ত্র বলে, দশ হাজার ছাত্রকে যে অন্নদান করে পোষণ করে, শিক্ষা দেয় সে-ই কুলপতি।

ছাত্রাণাং দশসহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

কাজেই এই বিপ্রর্ষি ধনীই হতেন। তা হলে সমাজে ক্ষত্রিয় রাজা, রাজন্য ছাড়াও কিছু ব্রাহ্মণ ধনী ছিল। আর ধনী ছিল এই সময়ে বাণিজ্যে অবতীর্ণ কিছু বৈশ্য, যারা দেশে ও বিদেশে পণ্যসঞ্চালনের কর্ণধার ছিল। এই সব কটি শ্রেণিরই অধিকাংশ সাধারণ মানুষ দরিদ্রই ছিল। শূদ্র প্রধানত চাষবাসে নিরত ছিল; সে কিছু পশুপালনও করত, ক্রীতদাস ও গৃহদাস হিসাবে কাজ করত; শিল্পদ্রব্য নির্মাণেও তাকে নিযুক্ত করা হত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিস্তর ছিল— যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যাদের স্থান হত না, রাজপ্রাসাদের কাছেও যারা পৌঁছতে পারত না। দরিদ্র ক্ষত্রিয়ও অনেক ছিল— শিশু, বৃদ্ধ, রমণী, অসুস্থ বা ক্ষীণকায় অথবা যাদের কোনও ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে স্থান জোটেনি তেমন মানুষ। তারা বর্ণধর্মের নির্দিষ্ট বৃত্তি ছেড়ে আপদ্ধর্মের নীতিতে জীবনরক্ষার জন্যে যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করত। সব বৈশ্য বণিক ছিল না। ওপরতলার মুষ্টিমেয় ক'জনই বাণিজ্যের সুযোগ পেত। বাকি বহুসংখ্যক বৈশ্য পশুপালন করে জীবিকানির্বাহ করত। আর শূদ্রের তো কথাই নেই, সে চিরকালই উচ্চ ত্রিবর্ণের পদসেবার দ্বারা প্রাণ ধারণ করত; আজও এটাই তার অবলম্বন। ব্যতিক্রমী দু-চারজন হয়তো সামান্য ধন সঞ্চয় করতে পারত শিল্পজীবী হয়ে বা শিল্পকর্ম করে, কিন্তু নেহাতই অল্পসংখ্যক ক'জন। তা হলে দেখা গেল, পুরো সমাজে বর্ণনির্বিশেষে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। এ সময়ে এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহ হত এবং মিশ্রবর্ণগুলি সংখ্যায় বাড়ছিল এবং এরা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে ছোট ছোট স্বতন্ত্র বৃত্তিগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল, তবে এ ব্যাপারটা অনেক দ্রুত ও বেশি পরিমাণে ঘটে মৌর্য যুগে ও তার পরে।

বহির্বাণিজ্যে শুধু পণ্যদ্রব্যই আসছিল না, নানা বিচিত্র ধর্মমত, দেবদেবী, সম্প্রদায়, জীবনবোধ, আচরণ-পদ্ধতিও আসছিল এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের মানচিত্রে নতুন যে পরিবর্তনটা চোখে পড়ে তা হল আর্যাবর্তে ষোলোটি মহাজনপদের অভ্যুত্থান। এগুলি হল: গান্ধার, কাম্বোজ, কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, মৎস্য, মল্ল, চেদি, বৎস, কাশী, কোসল, মগধ, অঙ্গ, অবন্তী, বৃজ্জি এবং অশ্মক। এই জনপদগুলির প্রত্যেকটি ছিল কোনও একজন রাজার দ্বারা শাসিত, রাজধানীর আশপাশে অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত। একটি জনপদে রাজধানী ছাড়া অন্য নগরও থাকত, বিশেষত, জনপদটি যদি আয়তনে খুব বড় হয়। নগরায়ণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার। প্রথমবার ঘটে প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার আমলে, যখন পুরো সিন্ধুসভ্যতা জুড়ে নানা নগর ছিল। আর্যরা আসবার পরে যে বিপর্যয় ঘটে তাতে বেশ কয়েকশো বছর ধরে নগরসভ্যতার অবক্ষয় ঘটে। পোড়া ইঁটের বাড়ি করার দক্ষতা ছিল না; রোদে-শুকনো-ইঁটের বাড়ি মাটির নীচে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই অংশে নগরের চিহ্নই পাননি। আবার খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি শস্যে স্বয়ম্ভরতা, শিল্পে স্বীকৃতিযোগ্য নির্মাণ, উদ্বৃত্ত অর্থে অধিকসংখ্যক চাষি ও কারিগরকে বৃত্তি দেওয়ার সম্ভাবনা, বাণিজ্য থেকে অধিক অর্থাগম এবং সাধারণ ভাবে নানা দিকে সমৃদ্ধির বিকাশ, অন্তত মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণির পক্ষে— এ

সমস্তই অনুকূল ছিল নতুন নতুন নগর নির্মাণের জন্যে।

নগর কী? যেখানে প্রাথমিক খাদ্যশস্যের চাষ প্রায়ই হয় না, হলেও অকিঞ্চিৎকর পরিমাণে হয়। সেখানে থাকে কে? রাজা, রাজকর্মচারী, বণিক, শিল্পী (তার কারখানা ও শিল্পশালায়), নানা জাতের কারিগর, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা, ধনীদের ভৃত্যকুল, সৈন্যরা এবং আগন্তুক রাজ অতিথিরা। বোঝাই যায়, এদের সংখ্যা অনেক এবং সকলেই ভরণপোষণের জন্যে নগরের বাইরের গ্রামগুলির ওপরে নির্ভরশীল। সেখানে চাষি চাষ করে, জেলে মাছ ধরে, তাঁতি তাঁত বোনে। যা কিছু এদের শুধু খেয়ে পরে বাঁচবার জন্যে, এবং কিছু লোকের বাহুল্যপূর্ণ শৌখিন ভাবে বাঁচবার জন্যে দরকার, তার প্রায় সবই নির্মিত হয় গ্রামে। গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগ প্রশাসনগত, রাজস্ব দেওয়া, সুরক্ষা পাওয়ার এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার। সেই সময় ধনী মালিক চাষে বা কারিগরিতে যাদের নিযুক্ত করত— প্রায়শই পেটভাতায়— তারাই খাজনা দিত; আধপেটা খেয়ে বাঁচিয়ে রাখত নগরগুলিকে, জোগাত তাদের নানা বিলাসের উপকরণ এবং বাণিজ্যের জন্যে পণ্যদ্রব্য।

নগরায়ণের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল শ্রেণিবিভাজন। আগে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চার বর্ণের কথা শুনেছি। ক্রমে ক্রমে নানা বিশিষ্ট বৃত্তির প্রয়োজনে এবং বর্ণগুলির মধ্যে ক্রমাগত অন্তর্বিবাহে বর্ণের স্থান নিল জাতি। কিন্তু বর্ণ ও জাতি মুখ্যত ছিল বৃত্তিনির্ধারিত। এখন বর্ণ ও জাতিকে এফোঁড়-ওফোঁড় চিরে ফেলে নতুন যে বিভাজনে সমাজের মুখ্য পরিচয় হল, তা হল শ্রেণি বিভাগ। এ বিভাগে ধনী ও নির্ধন যেমন একটা প্রধান পরিচয়গত ভাগ, তেমনই সঙ্গে সঙ্গেই এল শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। কিন্তু এ দুটি সমার্থক নয়। অনেক মূর্খ ধনী যেমন ছিল তেমনই অনেক দরিদ্র বিদ্বানও ছিল। কিন্তু সমাজ মেনে নিল যে, হাতেকলমে কাজ করাটা সামাজিক খাতিরের মানদণ্ডে নিচু, আর মাথা খাটিয়ে কাজ করাটা উঁচু মানের ব্যাপার। বোঝা কঠিন নয়, মান ও অর্থ এক আধারেই সর্বত্র থাকত না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষই মাথা নোয়াত ধনের কাছে এবং খুব উচ্চ কোটির বিদ্যাবত্তার কাছে। এ দুজনেই সংখ্যায় কম ছিল। সাধারণ মানুষ ছিল অবিদ্বান ও নির্ধন, এবং তারাই বহুগুণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সমাজে। দরিদ্র চাষি বা মজুরের শ্রম কেনার ক্ষমতা ছিল ধনীর; তেমনই নির্বিত্ত বুদ্ধিমানের বুদ্ধিবৃত্তিকে কিনে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের স্বার্থে নিয়োজিত করার সামর্থ্যও ছিল অল্প কয়েকজনের।

যে-যুগের কথা বলছি তখন যাযাবর আর্যরা কৃষিতে নিযুক্ত; তারা আর ভ্রাম্যমান নয়। জমিতে তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। এ সময়ে যে দর্শন ও ধর্মচর্চা চলছিল— বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক ও উপনিষদ্— তার মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন এবং কতক পরিমাণে আজীবিকও, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। উপনিষদের তত্ত্বের একটা দিক হয়তো সাধারণ মানুষ তার মতন করে বুঝতে পেরেছিল কিন্তু তার দর্শনের দিকটা তাদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। যজ্ঞ তখনও চলছিল এবং জটিল ও দীর্ঘবিলম্বিত নানা যজ্ঞ ও তাদের নানা অঙ্গ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন চলছিল পুরোহিতকুলের হাতে। ধর্মানন্দ কোসাম্বীর কথায়, 'সাধারণ ভাবে

একটি স্থিতিশীল উৎপাদক সমাজের আপাত উদ্দেশ্য হল পুরোহিত তন্ত্রের অর্থাগম। এদের অনুজ্ঞা হল কিছু কিছু অনুষ্ঠান করা আবশ্যক: একটি স্তরে এই সব পল্লবিত প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে সমাজের গতি রুদ্ধ করে, নতুন উদ্ভাবনের প্রতিবন্ধক হয়, সমাজের শ্রেণিবিন্যাস ও স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখে।'[১] উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থিতাবস্থা রক্ষিত হলে কৃষি একই জায়গায় থাকে, উৎপাদন বাড়ে যদি চাষের জমির পরিমাণ বাড়ে। ধনীরা চাষ, শিল্পপণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের দ্বারা মূলধন বাড়ালে চক্রবৃদ্ধি হারে তাদের লাভ ও ধনসম্পত্তি বেড়ে চলে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ চাষি বা মজুর তার দ্বারা উপকৃত হয় না।

কাঠের ফলার লাঙলে যে ধরনের চাষ হত তার চেয়ে নতুন কৃষিবিপ্লবে অর্থাৎ লোহার ফলার লাঙলে অনেকগুণ বেশি ফসল ফলত। আগে যখন মানুষ বনেজঙ্গলে খাদ্য আহরণ করত, তার চেয়ে বেশি এবং নিশ্চিত খাদ্য সে পেল গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে শিকার করে ও প্রকৃতির উৎপাদন কুড়িয়ে নিয়ে, কিন্তু এতেও পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষ নিতান্ত অসহায়ই ছিল।[২] চাষে মানুষ খাদ্য উৎপাদনে প্রকরণগত ভাবে নূতনতর, উন্নততর ধাপে পৌঁছয়। প্রথম দিকে কাঠের ফলার লাঙলে ফসল উৎপাদন অনেক বেশি সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য ছিল; পরে লোহার ফলায় উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল খাদ্যশস্য যব, গম, নানা জাতের ধান ছাড়াও অন্যান্য রবিশস্য আখ, ফল, সবজি, ইত্যাদিরও চাষ হত। লোকে গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, ইত্যাদি পালন করত দুধ এবং মাংসের জন্যে। পশুপালনের আগে মানুষ শিকার করে পশুমাংস খেত— মাংস খাবার অভ্যাস ও মাংসে রুচি সেই আদিম যুগ থেকেই আছে। এর পর পশুপালনের যুগেও মাংস খাওয়ার অভ্যাস ছিল এবং চাষের আগে পর্যন্ত, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের সঙ্গে মাংসই মুখ্য খাদ্য ছিল। মাংস সম্বন্ধে দুর্বলতা শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি থেকে বোঝা যায়। এ ছাড়াও পড়ি, মাংস অন্ন অর্থাৎ খাদ্য, 'পশুরা অন্ন, পশুর মাংস খাদ্য— অন্নং পশবোঽন্নমু পশোর্মাংসম্।' (শতপথব্রাহ্মণ ৭:৫:২:৪২) শুধু তাই নয়, এমন কথাও শুনি-যে 'এ-ই হল শ্রেষ্ঠ খাদ্য, (এই) মাংস, (পশুবন্ধ যাগে যাগকারী) সে (এই) পরম খাদ্যের খাদক হয়— এতদু হ বৈ পরমমন্নাদ্যং যন্মাংসং স পরমস্যৈবান্নাদ্যস্যাত্তা ভবতি।' (শ/ব্রা ১১:৭:১:৬) পরবর্তী কালের পুরাণে মাংসহীন ভোজন (ভোজনং মাংসরহিতম্) অভিশাপের ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু চাষ শুরু হওয়ার পর মাংস আর প্রধান আহার্য রইল না। প্রথমত, পশুপালন তখনও ছিল, কিন্তু সেটা তখন আর মুখ্য বৃত্তি ছিল না, চাষের সঙ্গে ফলমূলমধু-সংগ্রহের মতো একটা অনুপূরক

১. 'Generally the immediate purpose in settled producing society is profit for the priest class which insist that certain observances are necessary: at a deeper level, the unwidely mass of ritual serves to petrify the later society, to discourage innovation, to help preserve the class structure and the status quo'. D. D. Kosambi, *An Introduction to the study of Ancient Indian history*, p. 24

২. কোসাম্বী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

আহার্য সংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে রইল। দ্বিতীয়ত, মৃগয়া স্বভাবতই কমে এল। নিত্যকার বৃত্তি নয়, কালেভদ্রে কখনও কখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজা, রাজন্য ও ধনীরা মৃগয়া করতেন, খাদ্যসংস্থানের জন্যে ততটা নয়, যতটা শখ মেটানোর জন্যে। তৃতীয়ত, বহু ব্যাপ্ত পরিসরের জমি তখন হাতে এসেছে, লোহার লাঙলের ফলায় অল্পশ্রমে তাতে বেশি ফসল ফলানো যায়, তাই নানা রকম খাদ্যশস্য ফলসব্জি ফলানো চলছে এবং এগুলির বিশেষ সুবিধে হল, মৃগয়ালব্ধ মাংস যেমন তাহাতাড়ি খেয়ে শেষ করে না ফেললে পচে যায়, ফসল তত সহজে নষ্ট হয়ে যায় না, বেশ কিছুকাল ভাল ভাবেই জমিয়ে রেখে দেওয়া যায়। তাতে খাদ্য সম্বন্ধে একটা নিরাপত্তাবোধ আসে, যা মৃগয়ায় বা পশুপালনের যুগে ছিল না। তা ছাড়া মৃগয়া কমে যাওয়ায় এবং পশুপালন গৌণ উৎপাদনে পরিণত হওয়ায় ফসল ও সব্জির তুলনায় মাংস আর সহজলভ্য রইল না, কালেভদ্রে জুটত, অন্তত যারা খুব ধনী নয় তাদের ক্ষেত্রে। তত দিনে এরা মাছ খেতেও শিখেছে, তাই খাদ্যে বিকল্প বেড়েছে, খানিকটা বৈচিত্র্য এসেছে।

কার? অবশ্যই ধনীর। কারণ লোহার লাঙলের ফলার প্রচলনের ফলে কৃষিবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই জনসংখ্যাতেও একটা বিপ্লব দেখা দিতে বাধ্য; সভ্যতার ইতিহাসে এ ব্যাপার সর্বত্রই বারে বারে ঘটেছে। 'যখনই একটি জনগোষ্ঠী পূর্বের অনিয়মিত খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতির থেকে নিয়মিত ভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে শুরু করে তখনই তাদের সন্তানসন্ততির জন্ম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উন্নততর খাদ্যের জোগানের অর্থ হল, অধিক সংখায় সন্তানের জন্ম, অধিক সংখ্যায় পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বাঁচা, অধিক সংখ্যক ব্যক্তির বার্ধক্যে পৌঁছানোয়। আলোচ্য সময়কার "আর্য" মানে পশুচারণের দ্বারা জীবনধারণ করত এমন এক লড়াইবাজ গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষি জনগোষ্ঠী, যাদের বাড়তি খাদ্য জোগাত চাষ। এখন আর্যরা সেই ক্রান্তিকালে অবস্থিত যখন অল্পকালের মধ্যেই লাঙল পশুপালের চেয়ে বেশি খাদ্য জোগাবে। কাজেই যার প্রসার ঘটল তা হল, নতুন এক প্রণালীর জীবনযাত্রা... লাঙলের চাষ খাদ্যসংস্থানের অনেক বেশি উন্নতি ঘটাল এবং অনেক বেশি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে। এর অর্থ শুধু যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি তা-ই নয়, কিন্তু এমন একটি জনগোষ্ঠী যার একক পরিবারগুলির সদস্যও অনেক বেশি সংখ্যায় একত্র বাস করত।'[৩] এই বৃহৎ পরিবারের পারিভাষিক নাম 'কুল', যেখানে তিন-চার প্রজন্ম একত্রে বাস করে। তখন চাষের জন্যে সমাজ স্থিতিশীল এবং কয়েক প্রজন্মের সমবেত

৩. 'As soon as people take to regular food production from a previous irregular food gathering mode they bred more rapidly. The improved food supply means that more children are born, more survive to maturity, more people reach old age. "Aryan" at the period under discussion means a warlike tribal people who lived by cattle-breeding, supplemented by plough cultivation. The Aryans were at the crucial stage where soon the plough cultivation would produce more than cattle. So what spread was a new way of living. .. ...plough cultivation greatly improved the food supply, made it more regular. This meant not only a far greater population, but one that lived together in greater units. Kosambi.' পূর্বোক্ত; pp 113-14

পরিশ্রমের ফলে যেটুকু ফসল উঠত তা-ও প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত হত না। কাজেই সর্বব্যাপী অভাবটা থেকেই গেল। ধনী প্রচুর চাষের জমির মালিক এবং কারিগরি শ্রমিকদের মালিক মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে পেত, সঞ্চয় করতে পারত, বাণিজ্যে সে-সঞ্চয়কে পণ্যে পরিণত করে চক্রবৃদ্ধি হারে ধন বাড়িয়ে চলতে পারত। সমাজে প্রতিপত্তিশালী ছিল এরাই। কিন্তু এদের তুলনায় নিরন্ন বা অর্ধাহারী চাষি মজুরের সংখ্যা বহু বহু গুণে বেশি ছিল। কাজেই সমাজে খাদ্যাভাব ছিল প্রায় সার্বত্রিক।

পরবর্তী কালের সাহিত্যে এই খাদ্যাভাবের প্রচুর প্রমাণ মেলে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পড়ি 'যে অন্নভোজন করতে চায় সে প্রযাজ আহুতির সঙ্গে দক্ষিণার ব্যবস্থা করুক— যোঽন্নাদ্যমিচ্ছেৎ প্রযাজাহুতিভির্দক্ষিণা স ইয়াৎ।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২:৪) 'এই আহুতি অগ্নিতে দেবে অন্নভোজনের জন্যে 'অন্নপতিকে স্বাহা' এই (বলে), অন্ন যে ভোজন করে সে-ই অন্নপতি হয়, সন্তানসন্ততির সঙ্গে (অন্ন) আহার করে, যে একথা জানে— এতামাহুতিং জুহোত্যগ্নয়েঽন্নাদ্যায়া অন্নপতয়ে স্বাহেত্যন্নাদো হান্নপতির্ভবত্যশ্নুতে প্রজয়ান্নাদ্যং য এবং বেদ।' (ঐ ব্রা ৮:২:১১)

এখানে সন্তানসন্ততির ক্ষুধা নিবারণের জন্যে পিতামাতার স্বাভাবিক উদ্বেগ উচ্চারিত এবং এই বিশেষ যজ্ঞের দ্বারা নিজের ও সন্তানের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থার চেষ্টা হয়েছে। অন্ন তো শুধু অন্ন নয়, জীবনধারণের উপায়, তাই শুনি 'প্রাণকে অঙ্গীকার করে অন্ন এ জন্যে... মহাব্রত অনুষ্ঠান— প্রাণঃ প্রতিগৃণাত্যন্নমিত্যাদিত্যেন... মহাব্রতং... ভবতি।' (ঐ ব্রা ৫:৫:৩)

অন্ন-সমস্যা আজ শুধু মানুষের, কিন্তু একদা এ সমস্যা দেবতাদেরও ছিল; 'প্রজাপতি কামনা করলেন আমি অন্নভোজী হব, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞে এ দুটি মহিমান্বিত গ্রহ (যজ্ঞের আহুতিবিশেষ) "দেখলেন", সে দুটি গ্রহণ করলেন। তার পরে তিনি মহান্ অন্নভোক্তা হলেন। যে কেউ এই ইচ্ছা করেন, তার উচিত এই ভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা— প্রজাপতিরকাময়ত মহানন্নাদঃ স্যামিতি। স এতবশ্বমেধে মহিমানৌ (গ্রহৌ) অপশ্যৎ। তাবগৃহীত। ততঃ স মহানন্নাদোঽভবৎ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।' (৩:৯:৯:৪১)

যজ্ঞ করে অন্ন পাওয়া যায় এ বিশ্বাস সে যুগের ধর্মবোধের ভিত্তিতেই ছিল। যজ্ঞের দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় এ কথা জনমানসে প্রত্যয়যোগ্য করে তোলার সবচেয়ে বড় উপায় হল এই কথা বলা যে, একদা দেবতারাও অন্নাভাবে কষ্ট পেতেন; তাঁরা ঐশী শক্তির দ্বারা অন্ন সৃষ্টি করে ক্ষুধানিবারণ করেননি বা করতে পারেননি; তাঁদেরও যজ্ঞ করেই অন্নের সংস্থান করতে হয়েছিল। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাঁরা দেবতা বলে তাঁদের দিব্যদৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়েছিল কোন্ যজ্ঞ করলে অন্নলাভ হবে। সেই যজ্ঞ তাঁরা অনুষ্ঠান করে অন্ন পেয়েছিলেন এবং যজ্ঞটির উত্তরাধিকার পেল মানুষ, যাতে সে ক্ষুধার প্রতিকার কীভাবে করতে হয় সেই জ্ঞান প্রজন্মপরম্পরায় সঞ্চারিত করে যেতে পারে, উত্তরপুরুষের অনুরূপ অন্নাভাবের প্রতিবিধানের জন্য। অতিকথা (মিথ্)-এর শাস্ত্রে দেবতাদের এই প্রাথমিক যজ্ঞানুষ্ঠান যা সম্পাদিত হয়েছিল 'সে-ই সেকাল'-এ 'in illo tempore'-এর অনুষ্ঠানই

যজ্ঞটির আদিকল্প, মানুষের দ্বারা যার অনুষ্ঠান পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই ধরনের কাহিনি প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো আছে ধর্মগ্রন্থগুলিতে। এর দ্বারা, (১) খাদ্যাভাব একটা নিত্যকালের অবস্থা বলে প্রতিপন্ন হয়; (২) খাদ্যাভাব দেব-মানব নির্বিচারে সার্বত্রিক বলে প্রতিপন্ন হয়, (৩) দেবতাদের দিব্যদৃষ্টি ছাড়া যে এর প্রতিবিধানের উপায় ছিল না, সে কথাও প্রমাণ হয়; (৪) বিশেষ ভাবে লব্ধ এই জ্ঞানের মহিমা প্রতিপাদিত হল— প্রজাপতি এর দ্বার অভীষ্ট লাভ করেছেন সে কথায়; (৫) যা দেবতাদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ তা মানুষকেও প্রার্থিত ফল দিতে সমর্থ, মানুষের এ প্রত্যয়ও জন্মাল। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের মহিমা কীর্তিত হল, যাতে মানুষ ওই বিশেষ যজ্ঞের দ্বারা ইষ্টলাভ করার ভরসা পায়।

মনে রাখতে হবে, সে যুগে মানুষ নিজের চেষ্টায় প্রকৃতিকে বশ করতে বা নিজের অনুকূলে আনতে পারত না বলেই যজ্ঞের উদ্ভাবন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বারংবার এ ধরনের উপাখ্যান, যার পারিভাষিক নাম 'অর্থবাদ' (যা যজ্ঞক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও মহিমাকীর্তন করে)। যজ্ঞে মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা উৎপাদন করার জন্যেই এর আবিষ্কার। সে দিনের সমাজে মানুষ তার বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনেই অতিলৌকিকের শরণ নিতে বাধ্য হত, পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম পর্যায়ে মানুষের এই জাতীয় বিশ্বাস ও আচরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভাব্যতার নীতিতে কখনও কখনও তা ফল দিত, তাতে বিশ্বাস আরও বাড়ত; আবার ওই নীতিতেই অনেকবার তা ব্যর্থ হত, তখন অনুষ্ঠাতার বা অনুষ্ঠানের ত্রুটিকেই বিফলতার জন্যে দায়ী করা হত। এমনটা এখনও করা যায়। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না বলেই এরই উপরে বিশ্বাস ন্যস্ত করে মানুষ শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান করে চলত। যজ্ঞ সম্বন্ধে পরবর্তী কালের মীমাংসা-শাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে কত বার মানুষ বিধিমতে যজ্ঞ করেও প্রত্যাশিত ফল পায়নি। কিন্তু সে যুগের অনুন্নত বিজ্ঞান-চর্চা, প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নেহাৎ প্রাথমিক জ্ঞানটুকুই যাদের সম্বল, নানা দৈবদুর্বিপাকের সামনে যারা সম্পূর্ণ অসহায়, তারা যজ্ঞে খাদ্যসংস্থান হোক বা না হোক যজ্ঞ ছাড়া আর কীই বা করতে পারত? স্পষ্টতই মানবায়ত প্রয়াসে যেটুকু খাদ্য উৎপন্ন হত তা একেবারেই অপ্রতুল, তাই যজ্ঞ ও দেবতাই ছিল ভরসা।

শতপথব্রাহ্মণ বলে, 'যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরে সমস্ত দেবতারা এলেন, সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত যশ, সকল অন্নভোজন, সমস্ত সমৃদ্ধি— তাবনু সর্বে দেবা প্রেয়ুঃ সর্বা বিদ্যা সর্বং যশঃ সর্বমন্নাদ্যং সর্বা শ্রীঃ।' (১:৬:২:১৫)

এ বিশ্বাস না থাকলে যজ্ঞ হয় না, আর যজ্ঞ ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির কী-ই বা বিকল্প ছিল তখনকার মানুষের? সফল হোক বিফল হোক, যে কাজ মানুষ নিজের চেষ্টায় করতে পারছে না সে-ভার তার নিজের চেয়ে শক্তিমান দেবতার ওপরে অর্পণ করায় একটা লাভ ছিল: নিশ্চিন্ততা। ওই অসহায় যুগে সেটুকুও ত কম নয়, এই নিশ্চিন্ততা লাভ করার জন্যে এখনও ত মানুষ দেবতার ওপরে নিজের ভার সঁপে দেয়। 'এই অন্নভোজন উদিত হল যা প্রজাপতির অন্নাহার; যে এমন জেনে এখন উপবাস করে প্রজাপতি তাকে রক্ষা করেন; সে এ ভাবেই অন্নভোজী হয় যে এ কথা জেনে এখন উপবাস করে— ইদমন্নাদ্যমভ্যুত্তস্থৌ যদিদং

প্রজাপতেরন্নাদ্যং স যো হৈবং বিদ্বান্ সম্প্রত্যুপবসতি; অবতি হৈনং প্রজাপতিঃ স এবমেবান্নাদো ভবতি য এবং বিদ্বান্ সম্প্রত্যুপবসতি'; (শ/ব্রা ১:৬:৩:৩৭) 'যে এমন জেনে সে কারণে হবন করে সে অন্নভোজিত্ব লাভ করে— প্রাপ্নোতি হৈবৈতদন্নাদ্যং য এবং বিদ্বাংস্তর্হি জুহোতি।' (শ/ব্রা ২:৩:২:১২) দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন (এই আশা নিয়ে যে) 'সমৃদ্ধি লাভ করব, যশ লাভ করব, অন্নভোজী হব— দেবা হ বৈ সত্রমাসত শ্রিয়ং গচ্ছেম যশঃ স্যামন্নাদঃ স্যাম্।' (শ/ব্রা ৪:৬:৯:১) শ্রী ও যশের আকাঙ্ক্ষার মতোই দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, 'অন্নভোজী হব।' অর্থাৎ তাঁরা যজ্ঞ করার আগে অন্নভোজী ছিলেন না। এতে মানুষ ভরসা পায় অন্নাভাবে দেবতারাও একদা তাদেরই মতো কষ্ট পেয়েছেন। অতএব তাঁরা যে প্রক্রিয়ায় অন্নভোজী হয়েছেন সেটি মানুষকেও অন্নভোজী করবে। 'যে অন্নভোজী এবং অন্ন-উৎপাদক দর্শপূর্ণমাস যাগ জানে, সে অন্নভোজী হয়— স যো হৈবৈতাবন্নাদঞ্চান্নপ্রদুঞ্চ দর্শপূর্ণমাসে বেদান্নাদ হৈব ভবতি।' (শ/ব্রা ১২:২:৪:৬) 'অন্নকে যে সমষ্টিযজু বলে জানে, সে অন্নকে অবরুদ্ধ করে (বেঁধে রাখে), অন্ন দিয়ে যা কিছু জয় করা যায় তা জয় করে— স যো হ বা অন্নং সমষ্টিযজুরিতি বেদাব হান্নং রুন্ধে যৎ কিঞ্চনান্নেন জয্যং সর্বং হৈব তজ্জয়তি।' (শ/ব্রা ১১:২:৭:৩১)

এখানে লক্ষণীয় হল 'যা কিছু অন্ন দিয়ে জয় করা যায়': কী তা? ক্ষুধা, অভাব, কিছু কিছু রোগব্যাধি, দারিদ্র, মৃত্যু, নিরন্নতার সামাজিক গ্লানি, অযশ, সমাজের তাচ্ছিল্য। এখন বোঝা যায়, অন্ন প্রার্থনার সঙ্গে বারে বারেই কেন যশ, শ্রী যুক্ত হয়েছে। যে সমাজে ব্যাপক অন্নাভাব সেখানে যে অন্নবান্ অর্থাৎ যার যথেষ্ট অন্ন আছে সে সামাজিক প্রতিপত্তি পায়। 'দ্বাদশাহ সোমযাগের দ্বারা অন্নভোজিত্ব লাভ করা যায়। (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ; ১০:৩:৯) 'অন্নকামী ষোড়শী (যাগ) দ্বারা স্তব করবে। (ত/ম-ব্রা; ১২:১৩:১৮) 'বিরাট্ (ছন্দ) অন্নভোজিত্বকে অবরোধ করার জন্যে— বৈরাজমন্নাদ্যাস্যাবরুদ্ধ্যৈ।' (তা/ম-ব্রা; ১৩:৭:৮) এই ক্রিয়াপদটি— 'অবরোধ করা' বারবারই পাওয়া যায়। কী অবরোধ করা? অন্নভোজিত্বকে, অর্থাৎ প্রত্যেক দিন যেন ক্ষুধানিরসনের জন্য পর্যাপ্ত অন্ন পাওয়া যায় সেই নিশ্চয়তা। মনে পড়ে বাইবেলে 'প্রভুর প্রার্থনা'য় খুবই দীন বিনীত নিবেদন: আজকের খাওয়াটুকু যেন জোটে তারই জন্য মিনতি। এ প্রার্থনা অভুক্ত মানুষ রোজই করবে, তার প্রাত্যহিক আহারটুকুর জন্যে। সোমযাগে তিনবার সোম ছেঁচে রস বের করা হত; সন্ধ্যার সময়ের পেষণটির নাম 'তৃতীয় সবন', 'তার দ্বারা লোকে অন্ন, অনুচর, পশু লাভ করে এবং এগুলি দিয়ে প্রাচুর্যকে অবরুদ্ধ করে— অন্নবত্যো গণবত্যঃ পশুমত্যস্তৃতীয়সবনে ভবন্তি ভূমানমেব তাভিরবরুন্ধে।' (তা/ম-ব্রা; ১৮:৭:৪) আবার সেই 'নিশ্চয়তার' উল্লেখ অবরোধ করার কথা। 'গায়ত্রী (ছন্দ) মুখ, অন্ন সপ্তদশ, মুখে অন্নধারণ করে যে একথা জানে সে অন্ন আহার করে অন্নভোজী হয়— মুখং গায়ত্র্যন্নং সপ্তদশো মুখত এব তদন্নং ধত্তে। অন্নমত্ত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ।' (তা/ম-ব্রা; ১৯:১১:৫-৬) 'এগুলি (যজ্ঞীয় ক্রিয়া) দ্বারা অন্নভোজিত্ব অবরোধ করে— এতাভিরন্নাদ্যমবরুন্ধে।' (ত/ম-ব্রা; ২৩:১৭:২,৩) নানা প্রক্রিয়া, অঙ্গ, ছন্দ, স্তব, সোমপেষণ ইত্যাদি যজ্ঞের নানা অংশে বিভিন্ন

স্থানে 'অন্নকে অবরোধ' করার শক্তি আরোপিত হয়েছে। ঠিক কোন কারণে কোন কার্য হয়, যজ্ঞের কোনও প্রকরণের দ্বারা অন্নকে জয় করা অর্থাৎ অন্নের জোগানকে নিশ্চিত করা যায় তা জানা নেই বলেই আন্দাজে এ ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। জ্ঞান যেখানে নেই সেখানেই তো অনুমান।

যজ্ঞ হল একটি প্রক্রিয়া কিন্তু অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা শুধু দেবতাদেরই আছে, এ কথা নানা দেবতা সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে। 'এই অগ্নি হল অন্নভোজী এবং অন্নপতি— অন্নাদ বা এষ অন্নপতির্যদগ্নিঃ।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ২:১:৫) অগ্নিকে অন্নভোজী বলা হয়েছে কারণ যজ্ঞের হব্য অগ্নি দগ্ধ করে। 'সে-ই অন্নাহারী ও অন্নপতি হয়। সন্তানদের সঙ্গে অন্নভোজিত্ব ভোগ করে যে এ কথা জানে— অন্নাদ্যোঽন্নপতির্ভবত্যশ্নুতে প্রজয়া অন্নাদ্যং য এবং বিদ্বান।' (ঐ/ব্রা; ২:১:৬) 'পূষা পোষণ করেছিলেন... যে দেবতারা পুষ্টিপতি— পূষা অপোষয়ৎ... যে দেবা পুষ্টিপতয়ঃ।' (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; ১:৬:২:১৩) দেবতারা যজ্ঞে প্রীত হয়ে অন্নদান করে পোষণ করেন, তাই তাঁরা পুষ্টিপতি। 'পূষাই অন্ন— অন্নং বৈ পুষা।' (তৈ/ব্রা; ১:৭:৩:২০, ২১) পশুচারীদিগের দেবতা ছিলেন পূষা, শুধু যে পশুপালের তত্ত্বাবধান করতেন, তাদের প্রজনিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটাতেন তাই নয়, দল ছেড়ে কোনও পশু হারিয়ে গেলে তাকে পালে ফিরিয়েও আনতেন, এমন বিশ্বাস ছিল। কাজেই সেই পশুচারণের যুগে যখন পশুমাংস, দুধ, মাখন, দই, ইত্যাদি ছিল প্রধান খাদ্য, তখন পূষা পশুদের পুষ্টি ও কল্যাণসাধন করে অন্ন জোগাতেন। পরে চাষের যুগেও পশুচারণ অঙ্গ-বৃত্তি হিসেবে রইল, কাজেই তখনও ওই পশুপালের দেবতা, পুষ্টির দেবতা, অন্নের দেবতা হিসেবে থেকে গেলেন। ইন্দ্রের বিষয়ে শুনি 'অন্ন বহন করে আনেন শক্তিমান ধনবান এই রাজা— ইষাং বোঢ়া নৃপতির্বাজিনীবান্।' (তৈ/ব্রা ২:৮:৭:৫৫)

> 'প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছ থেকে সৃষ্ট হয়ে তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তখন প্রজাপতি রোদন করলেন। তিনি অন্ন হয়ে উদিত হলেন। প্রজারা অন্নভোজন লাভ করে প্রজাপতির কাছে এল। অন্নকে থাকতে দেখলে প্রজা কাছে আসে। যারা এমন জানে সে সব পুরুষ (তাদের) সবই অন্ন হয়, তারা সমস্ত অন্নকে অবরোধ করে— প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তা অস্মাৎ সৃষ্টা পরাচীরায়ন্। স এবং প্রজাপতিঃ রোদনমপশ্যৎ। সোঽন্নং ভূতোঽতিষ্ঠৎ। তা অন্নাদ্যমবিত্বা। প্রজাপতিং প্রজা উপাবর্তত। অন্নমেবৈবং ভূতং পশ্যন্তীঃ প্রজা উপাবর্তন্তে। য উ চৈমম্মিদং বেদ। সর্বান্যন্নানি ভবন্তি। সর্বে পুরুষঃ। সর্বান্যন্নান্যবরুন্ধে।' (তৈ/ব্রা; ২:৭:৯:২৪-২৬)

এখানে কয়েকটি ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হয়েছে: প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেও প্রজারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, পেছনে ফেলে চলে গেল, কারণ তারা খাবে কী? প্রজাপতির রোদনে কাজ হয়নি, কাজ হল যখন তিনি অন্ন হয়ে দেখা দিলেন, তখন খাদ্যের কাছে বুভুক্ষু প্রজারা ফিরে এল। খাদ্য সৃষ্টি করে খাদ্য দিয়ে প্রজার ওপরে আধিপত্য পেলেন প্রজাপতি। অন্যত্র

পড়ি, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন, 'তারা এঁকে দেখে অন্নকামী হয়ে চারিদিকে সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হল। তাদের (প্রজাপতি) বললেন, "কী চাও?" তারা বলল, "অন্নভোজিত্ব (চাই)" তিনি বললেন তা-ই (হবে), এই অন্নভোজিত্ব সৃষ্টি করেছি, (সেটি) সামগান। তাই তোমাদের দিচ্ছি— তা এনং দৃষ্ট্বা অন্নকাশিনীরভিতঃ সমস্তং পর্যবিশন্ তা অব্রবীৎ কিংকামাঃ স্থ ইতি। অন্নাদ্যকামা ইত্যব্রুবন। সো ব্রবীদেবং বৈ বেদমন্নাদ্যমসৃক্ষি সমৈব। তদ্বঃ প্রযচ্ছামীতি।' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ; ১:৩:১:১) মনে রাখতে হবে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণটি সামবেদের অন্তর্গত, তাই এখানে প্রজাদের অভীষ্ট অন্ন আসবে যজ্ঞে সামগানের পথ ধরে। অর্থাৎ সামগানের ফল হিসেবে প্রজাপতি প্রজাদের অন্ন জোগাবেন। প্রজাপতি স্রষ্টা, প্রজা সৃষ্টি করা মাত্রই কিন্তু প্রজারা প্রজাপতির বশবর্তী নয়, অনেক আখ্যানেই তারা বিদ্রোহ করে। অবশ্য প্রায়ই বিদ্রোহের একটা সঙ্গত কারণ থাকে: প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজা খাবে কী? বেদ বলে, যথাবিধি যজ্ঞ করলে দেবতারা আহারের সংস্থান করেন। কিন্তু যজ্ঞই যদি না করতে পারে?

> 'যজ্ঞ দেবতাদের কাছ থেকে উঠে ওপরে পালিয়ে গেল। বলল, "আমি তোমাদের অন্ন হব না।" দেবতারা বললেন, "না, তোমাকে আমাদের অন্ন হতেই হবে।" তাকে (যজ্ঞকে) দেবতারা মন্থন করলেন। (যজ্ঞ তা সহ্য করতে পারল না, সে ক্ষীণ হয়ে গেল; দেবতারা তার শুশ্রূষা করে আবার তাকে পুষ্ট করলেন— যজ্ঞো বৈ দেবেভ্য উদক্রামৎ ন বোঽন্নং ভবিষ্যামীতি। নেতি দেবা অব্রুবন্ অন্নমেব নো ভবিষ্যসীতি। তং দেবা বি মেথিরে...।' (গোপথব্রাহ্মণ, উত্তরভাগ; ২:৬)

এখানে কয়েকটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়। অন্নার্থী মানুষ বিধিমতে যজ্ঞ সম্পাদন করলে যজ্ঞ থেকে আহার্য আপনিই পাবে এমন যে একটি বিশ্বাস ছিল তা অতিসরলীকৃত। যজ্ঞ মানুষের খাদ্যের উৎস হতে অস্বীকার করল। হয়তো এক সময়ে যে যজ্ঞ করে খাদ্য পাওয়া যাচ্ছিল না, সে ঘটনার স্মৃতি এতে বিধৃত আছে। যাই হোক, ক্ষুধা বড় সাংঘাতিক জিনিস। দেবতারা যজ্ঞকে এনে তার দেহ মন্থন করলেন, বললেন, 'তোমাকে আমাদের খাদ্য হতেই হবে।' যজ্ঞ এই মন্থন যন্ত্রণায় কাতর ও ক্ষীণ হলে দেবতারাই শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করলেন। এর মধ্যে যেমন প্রথম প্রচেষ্টা— সরাসরি যজ্ঞ থেকে অন্ন লাভ— তা ব্যাহত হওয়ার কথা আছে, তেমনই চূড়ান্ত খাদ্যাভাবে যেমন করেই হোক আহার্যসংস্থানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেবতারা যজ্ঞকে কোনও ভাবে পীড়ন করলেন, এমন অযজ্ঞীয় আচরণ করলেন যাতে যজ্ঞ যন্ত্রণায় কাতর হল, তাও আছে। তখন যজ্ঞ দেবতাদের খাদ্য হতে রাজি হলে দেবতারা শুশ্রূষা অর্থাৎ নিষ্ঠার সঙ্গে বহুল উপকরণ খাদ্য নিয়ে যজ্ঞকে প্রীত ও পূর্ণাঙ্গ করে তুললেন। এ কাহিনিতে যজ্ঞবিধির বিবর্তন, সংযোগ, বিস্তার, হব্যদক্ষিণার বাহুল্য এ সবই ব্যঞ্জিত হয়েছে। অর্থাৎ যেমন তেমন করে যজ্ঞ করলে যজ্ঞ খাদ্যদানে বিমুখ থাকলেন, যথাবিধি প্রভূত যত্নে যজ্ঞ করলে পর যজ্ঞ দেবতাদের খাদ্য হতে সম্মত হলেন। খোদ দেবতাদেরই যদি এই অবস্থা তা হলে মানুষের আরও কত সাবধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, যাতে যজ্ঞ বাধাপ্রাপ্ত

না হয়, ত্রুটি না থাকে কর্মকাণ্ডে। তা হলে দেবতাদের শর্তে যেমন যজ্ঞ শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন, মানুষের আর্তি দেখেও তেমনই দয়া করবেন। যজ্ঞ থেকে অন্নলাভের মধ্যে অনেক ইতিহাস, বিবর্তন, বাধা ও তার নিরসন এখানে বিবৃত হল। কিন্তু যজ্ঞই যে অন্নলাভের উপায়, সে কথা দৃঢ় ভাবে ঘোষিত হয়ে রইল।

সোমযাগে পুরোহিত অগ্নিকে বলে, 'তুমিই আহার, অন্ন দিলাম, একথা যে জানে সে অন্নভোজী হয়— অত্তিরস্যন্নমদাসম্। অন্নাদো ভবতি যস্ত্বেবং বেদ।' (জৈ/ব্রা; ২:৭:২:৮) যজ্ঞে হব্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত; চোখে দেখা যেত হব্য অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে, কাজেই অগ্নি তা খেলেন, খাওয়ার যজ্ঞীয় চেহারা ছিল অগ্নির নৈবেদ্যভক্ষণ। তাই অগ্নিকে পুরোহিত বলেন, তুমি আহার স্বরূপ। যে এ কথা জানে, সে যজ্ঞে হবির্দান করে অগ্নির কাছ থেকে প্রার্থিত আহার লাভ করে। উপরের অংশে দেখছি অগ্নি, পূষা, প্রজাপতি সরাসরি ভাবে খাদ্যসংস্থানের সঙ্গে জড়িত। অন্যত্র অন্যান্য কোনও কোনও দেবতা প্রাকারান্তরে খাদ্যের স্রষ্টা বা দাতা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। যজ্ঞের মাধ্যমেই আসুক অথবা সরাসরি দেবতার আশীর্বাদেই পাওয়া যাক, প্রার্থনার ধরনটা একই: খাদ্য দাও। লোহার ফলার লাঙলের দিনে চাষে ফসল বাড়ল, কিন্তু ক্ষুধার উপশম হল না, অন্তত সাধারণ মানুষের নয়। বিশেষ একটি 'যজ্ঞ এবং স্তোত্রের ফলে মানুষ অন্নভোক্তা হয়— 'অন্নং বৈ ন্যূঙ্খঃ... অথোহন্নাদ্যং প্রজায়তে।' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ৫:৩:২) 'অন্নভোজী তা এর (সোমের) দ্বারা লাভ করে— তামনেন (সোমেন) সনতি।' (এ/ব্রা ৩:২:৩৬) অন্নলাভের হেতু এই (যজ্ঞের ক্রিয়া) তা-ই সম্পাদন করে। ('অন্নসনিমেবৈনং তৎ করোতি।' ঐ। ব্রা ৩:২:৩৭)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ শুরুই হচ্ছে যে মন্ত্রে তা হল, 'ব্রহ্মকে অবিচ্ছিন্ন কর, আমাকে তা পেতে দাও... ক্ষত্রকে... দাও অন্নকে... উর্জকে... ধনকে...পুষ্টিকে— ব্রহ্ম সন্ধত্তম্ তন্মে জিন্বতম্। ক্ষত্রম্.. ইষম্...উর্জম্... রয়িং... পুষ্টিম্।' (তৈ/ব্রা ১:১:১:১) 'খাদ্য, শক্তি আমাদের দাও— ইষমূর্জমস্মাসু ধত্তম্।' (তৈ/ব্রা; ১:১:১:৪) 'অথর্ব যেন আমাদের জন্যে খাদ্য রক্ষা করেন। এর দ্বারা অন্নকেই রক্ষা করে— অথর্ব পিতুং-মে সোপায়েত্যাহ। অন্নমেবৈতেন স্পৃণোতি।' (তৈ/ব্রা; ১:১:১০:৭৮) অন্নকে রক্ষা করা, অর্থাৎ অন্ন যেন না লুপ্ত হয়, এ আশঙ্কা ও এ প্রার্থনা সে যুগটিকেই সূচিত করছে। 'ধনের বৃদ্ধি, অন্ন, শক্তি আমাদের মধ্যে ধারণ করা হোক— রায়স্পোষমিষমূর্জস্মাসু দীধরৎ।' (তৈ/ব্রা; ২:৬:৪:১৩) 'আমার আয়ু, অন্নাহার, সন্ততি, পশু বৃদ্ধি কর— আয়ুরন্নাদ্যং প্রজাং পশুং মে পিন্বস্ব।' (তৈ/ব্রা ৩:৭:৬:৬০) 'বল ও পুষ্টি আমাদের জন্যে নিয়ে এস— উর্জং পুষ্টিং চ দদত্যাবৃৎস্ব।' (তৈ/ব্রা ৩:১০:৬:১) মন্ত্রগুলিতে বল, শক্তি, খাদ্য, পুষ্টি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। মুখ্য প্রার্থনা খাদ্যের, যা মানুষকে বল ও পুষ্টি দেবে, তার আয়ু বৃদ্ধি করবে। গোপথ ব্রাহ্মণ বলছে, 'অন্ন থেকেই বীর্য— অন্নাদ্বীর্যম্।' (গো/ব্রা, উত্তরভাগ; ৬:৪) কথাটা ঋগ্বেদে এবং অন্যত্র বারবার বলা হয়েছে। নতুন দেশের আদি অধিবাসীদের প্রতিকূলতা জয় করে আত্মশক্তিতে বিজয়ী হয়ে ওঠার জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল বল, শৌর্য, অস্ত্র, বাহন ইত্যাদি। অস্ত্র, রথ, বাহন সঙ্গে

নিয়েই এসেছিল আর্যরা; কিন্তু দীর্ঘদেহী, পেশীমান আর্যশরীর পর্যাপ্ত খাদ্য ছাড়া তো দুর্বল হয়ে পড়বে, হেরে যাবে প্রাগার্যদের সঙ্গে সংগ্রামে, তাই অন্নের এত আকুল প্রার্থনা, কেননা অন্ন থেকেই আসে বীর্য। অন্ন মানে ভাত শুধু নয়, খাদ্যমাত্রই অন্ন (যদদ্যতে তদন্নম্, যা খাওয়া হয় তাই অন্নম্)। এই শব্দটি ইন্দো-ইয়োরোপীয়, মূলত খাবার জিনিসই বোঝাত (তুলনীয় ইংরেজি edible, eat, জার্মান essen)। অন্ন যথেষ্ট পেলে তা থেকে শরীর বীর্য সংগ্রহ করবে, সেই শক্তিতে পরাক্রান্ত হয়ে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করতে পারবে। তখন লুণ্ঠিত পশু, স্বর্ণ, ভূমি, দাস, শস্য সবই আসবে তার হাতে, জয়ী হবে সে, এবং বিজিতদের ওপরে তার প্রভুত্ব স্থায়ী হবে। অতএব এ সবের মূলে যে খাদ্য, যা তারা নিজেদের চেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন বা সংগ্রহ করতে পারছে না, তার জন্যে যজ্ঞ ও দেবতার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অন্ন থেকে শুধু বল ও শক্তিই আসে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও আসে। 'তাই এখানে যার প্রচুর অন্ন, সে-ই দেশে সম্মানিত— তস্মাদ্ যস্যেবেহ ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি স এব ভূয়িষ্ঠং লোকে বিরাজতি।' (ঐ/ব্রা; ১:৫:৩৩) যে-অবস্থায় দেশে ব্যাপক অন্নাভাব তখন যে সৌভাগ্যশালীদের ভাণ্ডারে অন্নের প্রাচুর্য, সমাজ তাদেরই খাতিরে করে, ধনীর খাতির চিরদিনই, সব দেশেই। তাই পড়ি 'তাই হল সমৃদ্ধি, যেখানে খাবার লোক কম, খাবার বেশি— তদ্ধি সমৃদ্ধং যত্রাত্তা কনীয়ান্নাদ্যো ভূয়ান্।' (শতপথব্রাহ্মণ; ১:৩:২:১২) 'অন্নাহারই শ্রী'; তাই শুনি 'শ্রিয়ৈ অন্নাদ্যায়' (শ/ব্রা; ১:৫:১:৫) অর্থাৎ অন্নাহার ও সমৃদ্ধি সমার্থক, খেতে পেলেই বা সঞ্চয়ে প্রচুর খাদ্য থাকলেই মানুষ শ্রী-যুক্ত। 'অন্নই "গ্রহ"— (এ শব্দের যজ্ঞীয় পারিভাষিক অর্থ আছে, আর সাধারণ অর্থ হল 'যা গ্রহণ করে,' বা 'যার দ্বারা গ্রহণ করা যায়)। অন্নের দ্বারাই এ-সব গৃহীত, তাই যারা আমাদের অন্ন আহার করে, তারা সকলেই আমাদের অধীন— অন্নমেব গ্রহঃ অন্নেন হীদং সর্বং গৃহীতং তস্মাদ্ যাবতাং নোঽশনমশ্নন্তি তে নঃ।' (শ/ব্রা ৪:৬:৫:৪) এখানে খুব রূঢ় ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে খাদ্যের সামাজিক মান, ওজন ও সম্ভ্রমের ভিত্তি। যে আমার অন্ন আহার করে সে আমার অধীন। সামগ্রিক খাদ্যাভাবের দিনে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, আহার দিয়ে ক্ষুধিত মানুষকে কেনা যায়। ভৃত্য বা ভার্যা যে স্বামীর বশ, অধীন, সে ওই ভরণের দৌলতেই তো! ক্ষুধা এবং খাদ্যের সঙ্গে দেবতারা নানা ভাবে জড়িত। 'অন্ন থেকে অগ্নি হয়েছিলেন, অন্নই সোম, অন্নদাতাও তাই, এই সবই অন্ন— অন্নাদেবাগ্নিরভবদন্নং সোমোঽন্নাদশ্চ বা ইদং সর্বমন্নঞ্চ।' (শ/ব্রা ১১:১:৬:১৯)

এই যে অন্ন এ দেবতাদেরই হোক (অর্থাৎ হব্য) অথবা মানুষেরই হোক (খাদ্য) এ কখনও বিক্রি করবে না— ন দেবানামন্নং বিক্রীয়েত ন মনুষ্যাণাম্।' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ; ১:১৫:১:৫) এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ— অনুজ্ঞা হিসেবেও বটে, সমাজচিত্র হিসেবেও বটে। অনুজ্ঞার তিনটি দিক আছে: প্রথমত, অন্ন বিক্রয় করা যেতে পারত, অর্থাৎ সমাজে এর ক্রেতা-বিক্রেতা ছিল। দ্বিতীয়ত, বিক্রেতা হল সে যার প্রয়োজন ছাপিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত আছে,

আর ক্রেতা হল যার অন্ন নেই, ক্ষুধা আছে ও এমন কোনও সামগ্রী আছে, যার বিনিময়ে সে কেনাবেচা করতে পারে। সম্ভবত এ সময়ে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। তা হলে টাকা দিয়ে কেনাবেচারও সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয়ত, সমাজে ক্ষুধা, ক্ষুধার্তের ক্রয়সামর্থ্য, উদ্বৃত্তের বিক্রেতা থাকা সত্ত্বেও অন্নবিক্রয় নিষিদ্ধ। সামাজিক দিকটি হল এ অন্ন ভোজনযোগ্য, অর্থাৎ পাক-করা অন্ন, শস্য নয়। খাদ্যশস্যের কেনাবেচা তো চলতই। কেন এ নিষেধ? সম্ভবত সমাজপতিদের চেতনায় এমন বোধ ছিল যে, যে-অন্ন প্রাণদায়ী, তা যদি একবার পণ্য হয়ে ওঠে তবে সমাজ এমন এক পর্যায়ে নৃশংসতার অনুমোদন করবে যাতে মানুষ অমানুষ হয়ে উঠবে। তাই অন্নদান পুণ্য, তাই আজও 'ভাত-বেচা বামুন' নিন্দিত (দ্রষ্টব্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আদর্শ হিন্দু হোটেল*)। ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস নিয়ে কেনাবেচা একটা সংকোচের, গ্লানির ব্যাপার ছিল। তাই ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা সমস্ত সাহিত্যে মহাপুণ্য। দানে, দক্ষিণায়, অতিথি-আপ্যায়নে, দরিদ্র-ভোজনে, তীর্থে, ব্রতে, মানতে অন্নদানে বিশেষ পুণ্য ঘোষিত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে, মহাকাব্য দুটিতে, পুরাণে এবং পরবর্তী সাহিত্যেও। অন্নে মানুষের সহজাত অধিকার। জল বাতাসের মতোই এটি বেঁচে থাকার প্রাথমিক উপাদান। তাই জলবাতাসের মতোই অন্নকে শাস্ত্র কেনাবেচার বাইরে দেখতে চেয়েছে।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে— দেবতাদের অন্নও বেচো না। দেবতাদের অন্ন কী? হব্য। চারিদিকে ব্যাপক ক্ষুধার পরিবেশে যজ্ঞান্তে হব্যও হয়তো মূল্যের বিনিময়ে নিতে চাইত কিছু ক্ষুধার্ত মানুষ। কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু এই নিষেধই প্রকারান্তরে একটি প্রমাণ। মনে রাখতে হবে দর্শ পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয়, অগ্নিচয়ন সোমযাগ, সত্র, ইত্যাদিতে বহু পশু হনন করা হত; প্রচুর পরিমাণে চরু, পুরোডাশ্‌, দই, দুধ, আমিক্ষা (ছানা), মন্থ (ঘোল) মধু, সর্পিঃ (ঘি), সোমরস ও সুরা এবং প্রভূত পরিমাণে পশুমাংস হত হব্য। সম্ভবত যজ্ঞকারী যজমান, সতেরো জন প্রধান ঋত্বিক্‌ পুরোহিত ও তাদের সহকারীরাও অত খাদ্য খেয়ে উঠতে পারত না। এবং ঘি ছাড়া এ সবই দু' তিনদিনেই পচে যাবে, নষ্ট হবে। সেই নৈবেদ্যের উদ্বৃত্ত নিয়ে কিছু পুরোহিত হয়তো একটু আধটু ব্যবসা করতে অনিচ্ছুক ছিল না, তাই এ নিষেধ। দেবতার প্রসাদ বিক্রি আমাদেরও অচেনা নয়।

> 'অথর্ব কবন্ধের পুত্র কাবন্ধি 'বিচার' ছিল বুদ্ধিমান্‌, মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ। তার অত্যন্ত সম্মানবোধের জন্য সে মানুষের কাছে বিত্ত গ্রহণ করত না। তাকে তার মা বললেন, এই কুরু-পাঞ্চালের, অষ্টমগধের, কাশি-কোশলের, শল্ব-মৎস্যের, শবস-উশীনরের, উদীচ্যের শক্তিমানরা বলেছিলেন, 'এসবই তোমারই অন্ন (লোকে) খাচ্ছে, আমরা তোমার অতিরিক্ত মানের জন্যে খেতে পাচ্ছিনে, বাছা, যাও ঘোড়ার সন্ধান কর— বিচারো হ বৈ কাবন্ধিঃ কবন্ধস্যাথর্বাস্য পুত্রো মেধাবী মীমাংসকোঽনূচান আস। ন স্বেনাতিমানেন মানুষং বিত্তং নেয়ায়। তং মাতোবাচ ত এবৈতদন্নমবোচংস্ত ইমমেষু কুরুপাঞ্চালেষ্বষ্টমাগধেষু কাশিকৌশল্যেষু শাল্বমৎস্যেষু শবস-উশীনরেষূদীচ্যেষ্বন্নমদন্তীত্যথ বয়ং তবৈবাতিমানেনান্নাদ্যাস্মো বৎস বাহনমন্বিচ্ছেতি।' (গোপথব্রাহ্মণ, পূর্বভাগ; ২:৯)

কাহিনিটি পরবর্তী কালের হতে পারে, হয়তো বা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ের রচনা। কাবন্ধি 'বিচার' চাইলে শুধু তাদের পরিবারের সকলের যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তা-ই নয়, সে ধনীও হয়। মা তার দানে এই ঔদাসীন্য দেখে বললেন, যাও বাছা, যা তোমার পাওনা তা সংগ্রহ করতে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যাও।' এখানে দেখি, বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত এমন এক অভিমানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছায় অন্নচেষ্টা ত্যাগ করে ঘরে বসে ছিল। ফলে যা হওয়ার তা-ই হল। মা এবং সে, হয়তো পরিবারের অন্যরাও উপবাস করছে, কারণ 'বিচার' অন্যের কাছে সম্পত্তি নেবে না। এ সম্পতির মধ্যে তার উপার্জিত যজ্ঞক্রিয়ার দক্ষিণা; তার ঔদাসীন্যে অন্যেরা তা খাচ্ছে, তাই মা তাকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'যা তোমার প্রাপ্য তা সংগ্রহ করে আনো।' সে সম্ভবত গেল। কিন্তু এখানে যা লক্ষণীয়, কী বিপুল পরিমাণ অন্ন একজন পণ্ডিত ঋত্বিকের অধিকারে আসতে পারত। ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে যজ্ঞের যখন রমরমা অবস্থা তখন পুরোহিতরা ইচ্ছে করলে কী রকম ধনী ও অন্নবান্ হতে পারতেন এখানে সেই খবর পাই।

'ছ'টি ঋতু, প্রজাপতির দ্বারা (প্রথমে) তাঁর অন্নভোজিত্ব গ্রহণ করে ঋতুরা, পরে সেটা তাঁকে ফেরৎ দেয়— ষড়্ বা ঋতবঃ প্রজাপতিনৈবাস্যান্নাদ্যমাদায়র্তবো অস্মা অনু প্র যচ্ছন্তি।' (তৈ/সং; ৩:৪:৮:৬) ঋতুরা মাঝখানে একবার অন্নাহারী হয়। এ শক্তি মূলত প্রজাপতির, ঋতুরা নেয় কেননা ঋতুতে ঋতুতে ক্ষেত্রে নানা অন্ন জন্মায়, তা-ই ভোগ করে মানুষ, পরে সে-শক্তি প্রজাপতিতে ফিরে যায় এবং মানুষ প্রজাপতির নির্দেশিত যজ্ঞগুলি করে অন্ন লাভ করে। অর্থাৎ অন্নাহারের অধিকার প্রাথমিক ভাবে দেবতার— মানুষের নয়। ঋতুগুলি ফসল ফলিয়ে মানুষের অন্ন জোগায়, কিন্তু তা আহারের মুখ্য অধিকার প্রজাপতিরই থাকে। কাজেই অন্ন সম্বন্ধে মানুষের নিরন্তর অনিশ্চয় ও আতঙ্ক থেকেই যায়। এই অতিকথার পশ্চাতে সমাজের বাস্তব অন্নাভাবের একটা চিত্র রয়ে গেছে।

অন্নের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে বলা হয়েছে, 'সন্তান কামনা করে অদিতি ভাত রাঁধলেন, তার উচ্ছিষ্ট অংশ আহার করে তিনি গর্ভধারণ করলেন— অদিতির্বৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ তদুচ্ছিষ্টমশ্নাৎ সা গর্ভমধত্ত।' (গোপথব্রাহ্মণ, উত্তরভাগ; ২:১৫) এখানে দেখছি অন্ন শুধু প্রাণ ধারণের উপকরণই নয়, প্রাণ সৃষ্টিরও উপাদান। অদিতি দেবমাতা; আদিত্যরা তাঁর সন্তান; এই দ্বাদশ আদিত্যে সূর্যের নানা প্রকাশ, এঁরা দেবমণ্ডলীতে প্রধান দেবতা। কাজেই এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার— প্রধান দেবতাদের গর্ভে ধারণ করা— সেটা অদিতি কীভাবে সাধন করলেন? সেটা করলেন অন্ন পাক করে ও ভোজন করে। এতে অন্নের নতুন এক মহিমা প্রচারিত হল।

যজ্ঞে ব্যবহৃত কিছু কিছু বস্তুরও মাহাত্ম্য বেড়েছে অন্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। যেমন ডুমুর (উদুম্বর) গাছের কাঠ হল শুদ্ধ, তা দিয়ে তৈরি আসন, হাতা ইত্যাদি সব যজ্ঞে ব্যবহার হত। 'উদুম্বর হল অন্নভোজন, তাই তাতে বল ধৃত হয়। অন্নভোজন হল উদুম্বর— অন্নাদ্যমুদুম্বরমূর্জমেবাস্মিংস্তদন্নাদ্যং দধাতি, অন্নাদ্যমুদুম্বরমূর্জমেব তৎ।' (ঐ/ব্রা; ৮:২:৪:৫)

উদুম্বরের নিজের মাহাত্ম্য নগণ্য কিন্তু অন্নভোজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা বল হয়ে উঠল। এই কথা অন্যত্রও বলা হয়েছে। (তৈ/ব্রা; ১:২:৬:৪৮; ১:৩:৮:৪৯; তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ ৫.৪.২; ১৬:৬:৪৩; ১৮:২:১১)

অন্নকে নানা রূপে দেখা হয়েছে, নানা গুণে ভূষিত করা হয়েছে, নানা ভাবে, নানা নামে, নানা কারণে চাওয়া হয়েছে। 'অন্ন হল শান্তি, উত্তম চারণভূমিতে (এ শান্তি) ভগবতী হয়ে উঠুক— শান্তির্বা অন্নং সূর্যবসাদ্ ভগবতী হি ভূয়াঃ।' (ঐ/ব্রা; ৭:২:২) দশাক্ষর বিরাট্ ছন্দের সঙ্গে অন্নের সম্বন্ধ বারবার বলা হয়েছে। (ঐ/ব্রা; ১:৫:৩৩; ৫:৩:৪; ৬:৫:১০; ৬:৪:৮; তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ; ৮:১০:৮; ১২:১০:৮; ১২:১১:২২; তৈ/ব্রা; ১:৮:২:৪; ৩:৮:২:৮৩; ৩:৯:১৭:৬২; ১৩:৭:৮) 'অন্নের এই রূপ— সুরা— অন্নস্য বা এতদ্রূপং যৎসুরা।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৩:১৯) 'জরাবোধীয় (নামক সামগান)-ই অন্ন, মুখ গায়ত্রী। মুখ দিয়ে অন্নধারণ করে, আহার করে— অন্নং বৈ জরাবোধীয়ং মুখং গায়ত্রী মুখ এব তদন্নং ধত্তে অন্নমত্তি।' (তাণ্ড্য মহা-ব্রা; ১৪:৫:২৮) তেমন 'এ-ই হল সাক্ষাৎ অন্ন, এই যে ইলান্দ (সাম গান)— এতদ্বৈ সাক্ষাদন্নং যদিলান্দম্।' (তাণ্ড্য মহা-ব্রা; ৫:৩:২:১) আবার 'এই হল সাক্ষাৎ অন্ন এই যে রাজন (সামগান)— (এতদ্বৈ সাক্ষাদন্নং যদ্রাজনম্।' (তা/ম/ব্রা; ৫:৩:২) কোনও ব্রাহ্মণ সামগানকে অন্ন বলছে, কোনওটা-বা যজ্ঞ ও তার অঙ্গকে অন্ন বলছে, এর দ্বারা সব সম্প্রদায়ই অন্নের মাহাত্ম্য স্বীকার করে এর অত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেছে।

শুধু অন্নের জন্যে অন্নকে অবরোধ করার কথা বারবারই পাই, 'অন্নের অন্নের (জন্যে) হোম করে। অন্নের অন্নের অবরোধের জন্যে— অন্নস্যান্নস্য জুহোতি। অন্নস্যান্নস্যাবরুদ্ধ্যৈ।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:৮:৪৮; ১:৮:২:৪) যেমন করে হোক অন্নের জোগান যেন নিশ্চিত হয় সে চেষ্টাই নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কখনও অন্ন শুধু অন্নরূপেই, কখনও কোনও দেবতার রূপে, আবার কখনও যজ্ঞে ব্যবহৃত কোনও উপকরণ, যজ্ঞের কোনও অংশ, কোনও ছন্দ, কোনও বিশেষ যাগ— এ সবের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছে অন্ন। উদ্দেশ্য দুটি: প্রথমত, দেবতাদের বা যজ্ঞাঙ্গকে অন্নের স্বরূপ বললে দেবতারা প্রীত হয়ে অন্ন দান করবেন। দ্বিতীয়ত অন্ন যে স্বতই মহৎ, মহামূল্য, আরাধ্য— এটি প্রতিপন্ন হল। অন্ন থেকে সুরা তৈরি করা হত; সুরার জনপ্রিয়তাও অন্নের মাহাত্ম্য বাড়াল। 'অন্ন পূষা... রাজন্য ইন্দ্রের, অন্ন পূষা। অন্নাহারের দ্বারা উভয়দিককেই পরিগ্রহণ করে।' তাই রাজন্য অন্নাহারী হবে— 'অন্নং বৈ পূষা... ঐন্দ্রো বৈ রাজন্যোঽন্নং পূষা। অন্নাদ্যেনৈবমুভয়তঃ পরি গৃহ্নাতি। তস্মাদ্রাজন্যোঽন্নাদো ভাবুকঃ।' (তৈ/ব্রা ৩:৮:২৩:৯০) 'অন্ন চন্দ্রমা অন্ন প্রাণ— অন্নং বৈ চন্দ্রমাঃ অন্নং প্রাণাঃ।' (তৈ/ব্রা ৩/২/৩/১৯) 'অন্ন মরুদ্‌গণ— অন্নং মরুতঃ;' (তৈ/ব্রা ১:৭:৭:৪৩) ;এই যে ওদন এ-ই পরমেষ্ঠী— পরমেষ্ঠী বা এষ। যদোদনঃ।' (তৈ/ব্রা ১:৭:১০:৬৪) 'অন্ন হল জল। তার থেকে অন্ন জন্মায়। যেহেতু জল থেকে অন্ন জন্মায় (তাই) তা (এর দ্বারা) অবরুদ্ধ হয়— 'অন্নং বা আপঃ। তাভ্যো বা অন্নং জায়তে। যদদ্ভ্যোঽন্নং জায়তে।' (তদবরুন্ধে। তৈ/ব্রা ৩:৪:১৪:৫) এ কথা অন্যত্রও আছে, 'যা অন্ন তা-ই জল— তদ্ যদন্নমাপস্তাঃ।' (জৈ/ব্রা ১:৯:২:৫) 'যা কৃষ্ণ তা হল জল,

অন্ন, মন ও যজু'র রূপ... নীল রূপ হল জল, অন্ন, মন ও যজুর রূপ— যৎ কৃষ্ণং তদপাং রূপমন্নস্য মনসো যজুষঃ... নীলং রূপং তদপাং রূপমন্নস্য মনসো যজুষঃ।' (জৈ/ব্রা; ১:৮:১:৩)

জলের সঙ্গে অন্নের সম্পর্ক কৃষিজীবী মানুষের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। জলকে অবরোধ করা মানে পানীয় জলের জোগান সম্বন্ধে নিশ্চয়তা। বারেবারেই শোনা যায় প্রাণ বা জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অশনায়পিপাসে। অর্থাৎ নিরাপদ পানীয় জল সম্ভবত খুব সুলভ ছিল না। জলে ধানগাছ বাড়ে তাই ধান দিয়ে জলের জোগান সম্বন্ধে একটা আশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা। এই কথাই আবার শুনি, 'জলই অন্ন— পয় এবান্নম্।' (শতপথব্রাহ্মণ; ২:৫:১:৬) 'অন্ন প্রজাপতি— অন্নং বা অয়ং প্রজাপতিঃ।' (শ/ব্রা ৭:১:২:৪) 'বসুদের রূপ হল চাল— বসূনাং ব এতদ্রূপং যত্তণ্ডুলাঃ।' (তৈ/ব্রা; ৩:৮:১৪:৫) 'এগুলিই সাক্ষাৎ অন্ন, ঊষাগুলি'। অন্নাহারে এদের সমর্ধিত (সমৃদ্ধ) হয়।' (এ তে হি সাক্ষাদন্নং। যদূষাঃ। সাক্ষাদেবৈনমন্নাদ্যে সমর্ধয়ন্তি। তৈ/ব্রা ১:৩:৭:৪৫) ওপরের তালিকায় অন্ন পূষা, চন্দ্রমা, প্রাণ, বসু, মরুদ্‌গণ, ঊষা, পরমেষ্ঠী, জল (মনে রাখতে হবে 'আপঃ' বা জলও স্বতন্ত্ররূপে দেবতা ছিল)— এতগুলি দেবতার সঙ্গে অন্নকে সম্পৃক্ত করা আকস্মিক বা অহেতুক নয়। অন্নাভাবে জর্জরিত জনগোষ্ঠীর কাছে অন্ন দেবতার মতোই সুদূর, দুষ্প্রাপ্য, ক্ষমতাশালী ও আরাধ্য।

অন্ন বলতে তখন ওদন, তণ্ডুল বোঝাত, নীবার-ও বোঝাত; 'এ-ই পরম অন্ন, নীবার। এই পরম অন্নের আহারের দ্বারা অন্নকে অবরোধ করা যায়— এতদ্বৈ পরমমন্নং যন্নীবারাঃ। পরমেণৈবাস্মা অন্নাদ্যেনান্নমবরুন্ধে।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৭:৩৮; ১:৬; ৪:৩৩) 'অন্ন হল গম— অন্নং বৈ গোধূমাঃ।' (শ/ব্রা ৫:২:১:৩) আর ছিল চরু, দুধ ও তণ্ডুলে পক্ক খাদ্য, চরু দেবতাদের ওদন, চরু-ওদন হল প্রত্যক্ষ অন্ন— চরুর্বৈদেবানামোদনো হি চরুরোদনো হি প্রতক্ষ্যমন্নম্।' (শ/ব্রা ৪:৪:২:১) নানা রকম শস্যবীজ তখন চাষ হচ্ছে, কোনও কোনওটাকে দেবতার ভোজ্য বলে তার সম্মান বাড়ানো হচ্ছে, যাতে যত্নে চাষ ও সংরক্ষণ হয়, যেন অপচয় না হয়।

'অন্নই 'বাজ' (শক্তি), অন্নকেই অবরোধ করা হয়— অন্নং বৈ বাজঃ। অন্নমেবাবরুন্ধে।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৮:৫২; তাণ্ড্য ম-ব্রা ১৩:৯:১৩; ১৪:৫:৫) অন্যত্র বলেছে, 'অন্নপেয়ই হল বাজপেয় (যাগ)— অন্নপেয়ং হ বৈ নামেতদ্ যদ্বাজপেয়ম্।' (শ/ব্রা ৫:১:৩:৩; ৫:১:৪:১২; ৫:২:২:১) 'অন্নই বাজ, অন্নের দ্বারা জয় করা এই কথা বলা হয়েছে— অন্নং হি বাজোঽন্নজিত ইত্যেবৈতদাহ।' (শ/ব্রা ৫:১:৪:১৫) বাজপেয় একটি পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ যাগ; এটা জটিল ও ব্যয়সাধ্য, কিন্তু যজমানের সম্মান বৃদ্ধি করত। এই শাস্ত্রাংশে বলা হল এ যজ্ঞ অন্নকেন্দ্রিক, অন্নই বাজ। এই কথা বলাতে অন্ন বিশেষ একটি সম্মান লাভ করল। 'পূর্বকালে বাক্-ই দেবতাদের অন্ন ছিল— বাগ্ বৈ দেবানাং পুরান্নমাসীৎ।' (তৈ/ব্রা ১:৩:৬:২৭) এ কথা বৈদিক সাহিত্যে শুধু নয়, সমস্ত প্রাচীন ধর্ম সাহিত্যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বাক্ হল সেই উপাদান যা দিয়ে মন্ত্র নির্মিত হয়। এই মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী? মন্ত্রে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব সৃষ্টি করে, এর দ্বারা বিশ্বভুবন সৃষ্ট হয়; এ শুধু শব্দসমষ্টি নয়; শক্তিপূত, তেজোগর্ভ শব্দসমষ্টি। এবং এমন যে-বাক্, তা ছিল দেবতাদের অন্ন, যা আহার করে তাঁরা শুধু বাঁচতেন না, সৃষ্টি

করতেন। কাজেই বাক্‌কে অন্ন বলে সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে অন্নের সঙ্গে সমীকৃত করা হল। 'অন্নকে প্রাণ, অন্ন অপান বলা হয়েছে। অন্নকে মৃত্যু, তাকেই জীবনের অবলম্বন বলা হয়েছে— অন্নং প্রাণমন্নমপানমাহুঃ। অন্নং মৃত্যুঃ তমু জীবাতুমাহুঃ।' (তৈ/ব্রা ২:৮:৮:৬১) প্রাণবায়ু অপানবায়ু দেহের মধ্যে থাকে বলে মনে করা হত। কিন্তু মৃত্যু কেন? অন্নাভাবই মৃত্যু আর অন্নাহার হল জীবাতু, জীবনের মূল উপাদান। এ যেন অন্নের স্তব।

অন্নাভাব যে কী মারাত্মক হতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের বেশ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। সতেরো সংখ্যাটি যজ্ঞের সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত। বলা আছে অন্নই হল সপ্তদশ, 'মধ্যে যে সাত থাকে, (দু'দিকে) পাঁচ পাঁচ থাকে, সেই মধ্যেরটিই ক্ষুধাকে ধারণ করে; তাতে প্রজা ক্ষুধাহীন হয়— অন্নং বৈ সপ্তদশ, যৎ সপ্ত মধ্যং ভবতি পঞ্চ পঞ্চাভিতোঽন্নমেব তন্মধ্যতো ধীয়তে অনশনায়ুকো ভবত্যনশনায়ুকঃ প্রজাঃ।' (ত/ম/ব্রা ২:৭:৭) দু'পাশে পাঁচ পাঁচ সংখ্যায়, ঊন, মধ্যের সপ্ত অধিক, এবং মধ্যেরটি নিরাপদে অক্ষুধা বা ক্ষুন্নিবারণকে ধারণ করে। যজ্ঞের এই রূপকবিনির্মাণের একটিই উদ্দেশ: ওই সপ্ত প্রজার অন্নসংস্থানকে নিরাপদে ধারণ করে, যাতে প্রজা ক্ষুধা থেকে অব্যাহতি পায়। এটি ছিল সে সমাজের একটি পরম কাম্যবস্তু।

যেন খেতে পাই, এই কথাটি অসংখ্য প্রার্থনার মূল কথা। 'ব্রহ্মোদ্য' হল ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনাসভা। এটা প্রায়ই ধনী রাজন্য বা রাজার আমন্ত্রণে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। একটি উদ্দেশ্য অন্নলাভ, 'ব্রহ্মোদ্য অন্নদান করে, ব্রহ্মপত্নী অন্নদান করেন— ব্রহ্মোদ্যং চান্নাদা ব্রহ্মপত্নী চান্নাদাঃ।' (ঐ/ব্রা ৫:৪:৬) 'আমি অন্ন আহার করছি— অহমন্নমহমদস্তমস্মি।' (তৈ/ব্রা ২:৮:৮:৪৮) এই কথা বারবার বলা হয়েছে। মন্ত্র জপ করার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, 'অন্ন (উৎপাদন) করব, অন্নে প্রবেশ করব, অন্ন জন্মাব— অন্নং করিষ্যাম্যন্নং প্রবিষ্যাম্যন্নঞ্জনয়িষ্যামি।' (তা/ম/ব্রা ১:৩:৬-৭) তেমনই শুনি, 'অন্ন (উৎপাদন) করেছি, অন্ন হয়েছে, অন্নের জন্ম দিয়েছি— অন্নমকরমন্নমভূদন্নমজীজনম্।' (তা/ম/ব্রা ১:৮:৭) রাজা কামনা করছেন, 'অন্নবান্, ওদনবান্, আমিক্ষা (ছানা)-বান্, যেন এদের রাজা হই— অন্নবতামোদনবতামামিক্ষাবতাম্। এষাং রাজা ভূয়াসম্।' (তৈ/ব্রা; ২:৭:১৬:৫৮) অর্থাৎ রাজার প্রজারা যেন থাকে দুধে-ভাতে; ভাত এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের অভাব যেন তাঁর রাজ্যে না থাকে। বলা বাহুল্য, এটি বাসনামাত্রই। কোনও কোনও রাজার রাজ্যে, কোনও কোনও যুগে, স্বল্পকালের জন্যে ক্ষুধার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম থাকত নিশ্চয়ই, কিন্তু মোটের ওপরে তা ব্যতিক্রমী, স্বল্পস্থায়ী। ব্যাপক ক্ষুধার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু এত অজস্র, এত আর্তকরুণ প্রার্থনা উচ্চারিত হতে পারে এত দিন ধরে। তবে রাজা ত সুখী প্রজা অর্থাৎ খেতে পায় এমন প্রজারই স্বপ্ন দেখবেন। এ সেই স্বপ্নের বর্ণনা। আগেই যেমন দেখেছি পরীক্ষিৎ রাজার রাজ্যে ধনীগৃহের গৃহিণী স্বামীকে প্রশ্ন করছে— 'দধি, মন্থ ও শরবৎ আছে বাড়িতে, কোন্‌টা দেব তোমাকে?' (অথর্ব সং; ২:১২৮:৯)।

'অন্নের অন্নপতি বলবত্তা নীরোগিতা দিয়েছিলেন, নমস্কার করি বিশ্বজনের মঙ্গলের জন্যে, হে পালয়িত্রি, আমাদের ক্ষতি কোরো না— অন্নস্যান্নপতিঃ প্রাদাদনমীবস্য শুষ্মিণো নমো

বিশ্বজনস্য, ক্ষামায় ভুঞ্জতি মা মা হিংসীঃ।' (তা/ম/ব্রা; ১:৮:৭) 'অন্ন কাছে, অন্ন আমাদের কাছে (আসুক)— উপ বা অন্নমন্নমেবাস্মা উপাবঃ।' (তা/ম/ব্রা; ৬:৯:৩) অন্ন যখন দুর্লভ হয়, তখন মনে হয়, অন্ন দূরে সরে গেছে, তাই প্রার্থনা ওঠে 'কাছে আসুক অন্ন।' একটি খুব ঘরোয়া ছবি পাই রান্না খাওয়ার। 'বাড়ি বাড়ি অন্ন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন যদি (কেউ কেউ) প্রশ্ন করে "কী করছে? এই লোকগুলি?" যজমানরা বলবেন— '(ওরা) অন্ন আহার করছে— কুলে কুলে অন্নং ক্রিয়তে তদ্ পৃচ্ছেয়ুঃ কিমিদং কুর্বন্তীমে যজমানা অন্নমৎস্যন্তীতি ব্রূয়ুঃ।' (তা/ম/ব্রা; ৫:৬:৯) রান্নার সময়ে 'কী করছে' প্রশ্ন করলে বলতে হবে 'ভাত খাচ্ছে।' এটা ইচ্ছাপূরক উত্তর, শুভ উত্তর, অশুভনিবারক উত্তর। 'কুল' মানে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার, সেই সব পরিবারে ভাত রান্না হওয়ার সময়ে বলতে হবে, এরা খাচ্ছে। উদ্দেশ্য 'যেন এরা খেতে পায়।' 'অন্নাহারকে নিশ্চিত করে— অন্নাদ্যমব রুন্ধে।' (তা/ম/ব্রা; ৬:১৮:২,১১; ১৬:৬:৬,৭,৮) এই অবরোধ করার অর্থ 'বেঁধে রাখে'— অসংখ্যবার এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কী করে অন্নকে অবরুদ্ধ করা যায়। অর্থাৎ আশঙ্কা ছিল, অসতর্ক হলে, যজ্ঞে, স্তবে, নৈবেদ্যে কোনও ত্রুটি ঘটলে অন্ন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, ক্ষুধার অন্ন জুটবে না, বা তার কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না। এই কথাই অন্যত্র, 'অন্ন হল ব্রত। যা খেয়ে, মানুষ বাঁচে, সংবৎসর এই অন্নের দ্বারা অন্নভোজনকে অবরোধ করে— অন্নং ব্রতম্, সংবৎসরাদেতে-নান্নেনান্নাদ্যমবরুন্ধে।' (তা/ম/ব্রা; ১৬:৭:৫) 'প্রজাপতি মহান, তাঁর ব্রত এই অন্ন— প্রজাপতির্বাব মহাংস্তস্যৈতদ্ ব্রতমন্নমেব।' (তা/ম/ব্রা; ৪:১০:২) প্রজাপতির ব্রত অন্ন মানে তিনি স্বয়ং অন্ন আহার করে বেঁচে থাকেন; এ কথার দ্বারা অন্নের গরিমা বৃদ্ধি পায়; মানুষ ত কোন্ ছার, স্বয়ং প্রজাপতি বেঁচে থাকেন অন্নের জোরে। অতএব অন্ন সম্বন্ধে একান্ত এই প্রার্থনা আরও জোর পেল: এ হল সেই অন্ন যা স্বয়ং প্রজাপতিকে বাঁচিয়ে রাখে। 'এর জন্যে সকল দিক থেকে অন্নাহারকে অবরোধ করে— সর্বাভ্য এবাস্মৈ দিগ্‌ভ্যোঽন্নাদ্যমেবাবরুন্ধে।' (তা/ম/ব্রা; ১৬:১৩:১১) সমস্ত সমাজে দীর্ঘকাল ধরে এই এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত প্রার্থনা ছিল: অন্ন যেন অবরুদ্ধ হয় অর্থাৎ তাদের ঘরে অন্ন ও অন্নাহার যেন বাঁধা থাকে। এর যেন কোনও ব্যত্যয় না হয়। এর জন্য শাস্ত্রে যা কিছু করণীয় বলে নির্দেশ করেছে সবই তারা অবিকল ভাবে পালন করবে, কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয় বা নিয়মিত অন্নলাভের সম্বন্ধে সংশয় যেন তাদের না থাকে। 'অন্নই ভদ্র। অন্নাহারের দ্বারা একে সৃষ্টি করা হয়েছে— অন্ন বৈ ভদ্রম্। অন্নাদ্যেনৈবৈনং সংসৃজতি।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:৩:১৯)

অন্নকেও মাঝে মাঝে মালিন্য স্পর্শ করে তখন তা শোধন করার প্রয়োজন হয়। 'দেবতারা ব্রহ্মার ও অন্নের মালিন্য দূর করেছিলেন— দেবা বৈ ব্রহ্মণশ্চান্নস্য শমলমপাঘ্নন্।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:২:১৩) এমনই কথা আবার শুনি 'যজমানের থেকে অন্নের মালিন্য দূর করে। অন্নের মালিন্য হল সুরা— অন্নস্যৈব শমলং যজমানাদপহন্তি। অন্নস্য বা এতচ্ছমলং যৎ সুরা।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:৩:১৪) অন্নের মালিন্য শুনলে খটকা লাগে, কিন্তু একই নিঃশ্বাসে বলা হয়েছে দেবতারা ব্রহ্মার ও অন্নের মালিন্য দূর করেছিলেন। ব্রহ্মার যখন মালিন্য হতে পারে, তখন

অন্নের তো তা হতেই পারে; দেবতারা তা দূর করেছিলেন। এ দুটি শাস্ত্রাংশকে একত্র দেখা হয়তো ঠিক হবে না, যদিও সে সম্ভাবনা থেকেই যায়— এ দুটি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে খুব কাছাকাছি অংশ। তা যদি হয় তাহলে দেবতারা অন্নের যে-মালিন্য দূর করেছিলেন তা হল সুরা; ব্রহ্মা হয়তো সেই সুরায় আসক্ত ছিলেন, দেবতারা তা থেকে তাঁকে মুক্ত করেন। কিন্তু অন্ন থেকেও সুরা প্রস্তুত হত, তার সম্বন্ধে আসক্তিও সমাজ থেকে থাকবে। সমাজের একটি অংশের চোখে হয়তো সুরা প্রস্তুত করবার জন্যে যে-পরিমাণ অন্ন লাগত সেটা অপচয় বলে মনে হত। হওয়াটা অস্বাভাবিকও নয়, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যেখানে উদরপূর্তির পথে যথেষ্ট পরিমাণ অন্নের সংকুলান ছিল না, সেখানে নেশার জন্যে অন্নের অপচয়টা আপত্তির কারণ বলে মনে হতেই পারে। তাই অন্নের মালিন্য সুরা। অন্ন এবং ব্রহ্মার মালিন্য দূর করতে দেবতাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল।

অন্নের অপচয় বন্ধের প্রচেষ্টার পশচাতে আছে অন্ন সংরক্ষণের একান্ত প্রয়োজন, এবং সে বিষয়ে সতর্ক যত্ন। কারণ, 'অন্নই জীবন— অন্নং হ প্রাণঃ।' (ঐ/ব্রা; ৮:৩:১) '(সদ্যোজাত) পুত্রকে অন্নাহারে যেমন স্তন দান করা হয়, তেমনই জীবকে অন্নাহার দান করা হয়— অস্মৈ জাতায়ান্নাদ্যং প্রতিদধাতি যথা কুমারায় স্তনম্।' (ঐ/ব্রা; ৬:৫:৩,৪) শতপথব্রাহ্মণেও দেখি, 'যেমন সদ্যোজাত কুমারকে বা বাছুরকে স্তন্য দান করা হয় তেমনই একে অন্ন দেওয়ার হয়— যথা কুমারায় বা জাতায় বৎসায় বা স্তনমপি দধ্যাৎ এবমস্মা এতদন্নস্যাপি দধাতি।' (শ/ব্রা; ২:২:২:১) সদ্যোজাত শিশু স্তন্য ছাড়া বাঁচে না, তেমনই মানুষ অন্ন ছাড়া বাঁচে না। অন্ন প্রাণস্বরূপ, 'মানুষের অভ্যন্তরে প্রাণকে ধারণ করে সে যে (যজ্ঞীয়) অগ্নিগুলিকে ধারণ করে, তাদের মধ্যে এ শ্রেষ্ঠ অন্নভোজী হয়— প্রাণান্ বা এষ অভ্যাত্মন্ ধত্তে যোঽগ্নীনাধত্তে তেষামেষোঽন্নাদতমো ভবতি।' (ঐ/ব্রা; ৭:২:১১) 'অন্নই প্রাণ'— এ কথার সঙ্গে বলা হয়েছে 'খাদ্যই হল প্রাণ, তাই নিজের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করে— প্রাণো বৈ ভক্ষস্তৎ প্রাণঃ পুনরাত্মন্ ধত্তে।' (শ/ব্রা; ৪:২:১:২৯) 'খাদ্য হল আয়ুষ্কর রস— রসমন্নমিহায়ুষে।' (তৈ/ব্রা; ১:২:১:২৫) দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যও প্রাণধারণের উপকরণ, তাই 'গাভী হল প্রাণ, অন্নই প্রাণ— প্রাণো হি গৌরন্নং হি প্রাণঃ।' (শ/ব্রা; ৪:৩:৪:২৫) উদুম্বর বা ডুমুর ছিল খাদ্য; এবং আগেই বলেছি, যজ্ঞে ডুমুরকাঠও ব্যবহৃত হত। 'উদুম্বর থেকে শক্তি, তেমনই অন্নাহার থেকে বনস্পতিদের শক্তি; এর (মানুষের) মধ্যে (হয়) অন্নাহার ও ভোজ্য— অথ যদৌদুম্বরাদূর্জো বা এষোঽন্নাদাদ্ বনস্পতীনামূর্জমেবাস্মিংস্তদন্নাদ্যং ভৌজ্যঞ্চ।' (ঐ/ব্রা ৭:৫:৬) 'এই সেই অন্ন যা প্রাণ ও প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন, এই হল সকল যজ্ঞ, যজ্ঞই হল দেবতাদের অন্ন— এতদ্বৈ তদন্নং যত্তৎপ্রাণাশ্চ প্রজাপতিশ্চাসৃজন্তৈতাবান্ বৈ সার্বা যজ্ঞো যজ্ঞ উ দেবানামন্নম্।' (শ/ব্রা; ৮:১:২:১০) যজ্ঞে যা হব্য দেওয়া হয় তা দেবতারা আহার করেন এমন বিশ্বাস ছিলই; এখানে বলা হচ্ছে, অন্নই প্রাণ। অর্থাৎ দেবতারা যেমন যজ্ঞে আহার্য লাভ করেন, মানুষও তেমনই পায় অন্নে; কেউই আহার্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। 'প্রাণীর মধ্যে অঙ্গগুলি প্রাণকে ধারণ করে, সেই প্রাণই প্রাণ, প্রাণভৃৎ অন্নই প্রাণকে

ধারণ করে— প্রাণভৃতি অঙ্গানি হি প্রাণান বিভ্রতি, প্রাণাস্তু এব প্রাণা অন্নং প্রাণভৃদন্নং হি প্রাণান্ বিভর্তি।' (শ/ব্রা; ৮:১:৩:৯) অন্নকে এ ভাবে বারবার প্রাণের সমার্থক হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'জল হল সাক্ষাৎ অন্ন, তা প্রাণের জন্যে অন্ন ধারণ করে— অন্নং বা আপোঽনন্তর্হিতং তৎ প্রাণেভ্যোঽন্নং দধাতি।' (শ/ব্রা; ৮:২:৩:৬) জল খাদ্যের মতোই জীবনধারণের একটি মুখ্য উপাদান; ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই-ই মানুষের প্রাণকে পীড়িত ও ক্ষীণ করে, তাই অশনায়াপিপাসে, অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণাকে মৃত্যুর সমার্থক বলা হয়েছে।

আহারের পরে স্থালীতে যে-অন্নটুকু থাকে সেটা খাবে না ফেলে দেবে, এ নিয়ে একটা বিতর্ক ছিল। সে প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হল, 'যদি খায় তাহলে মহিমান্বিত অন্ন ভোজন করে। পরম আয়ুষ্মান হয়— যৎ প্রাশ্নীয়াৎ। জন্যমন্নমদ্যাৎ। প্রমায়ুকঃ স্যাৎ।' (তৈ/ব্রা; ১:৩:১৫:৬২) এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ শাস্ত্রাংশ। খাবার পর স্থালীতে বেশি অন্ন থাকার কথা নয়, সামান্য কিছু গায়ে যা লেগে থাকে বিতর্ক তাই নিয়ে। সিদ্ধান্তটি লক্ষণীয়, ঐ-টুকু অন্ন মহিমান্বিত; অর্থাৎ অন্নের মতো দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য বস্তু সামান্য পরিমাণও অপচয় করলে কোথায় যেন ত্রুটি হয়, অন্নের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়; না করলে অন্নের মহিমা যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়। অন্নকে খাতির করলে অন্নও খাতির করে, অন্নাভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 'তা-ই হল সমৃদ্ধি, যখন আগেকার অন্ন নিঃশেষ হওয়ার আগেই, অন্য অন্ন আসে; তারই (সেই মানুষের অর্থাৎ ওই অন্নের মালিকের) বহু অন্ন হয়— তদ্ধি সমৃদ্ধং যদক্ষীণে এব পূর্বস্মিন্নন্নেঽথাপরসন্নমাগচ্ছতি স হি বহ্বন্ন এব ভবতি।' (শ/ব্রা; ১:৬:৪:১৪) এ-ই ছিল স্বপ্ন। অন্ন নিঃশেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী অন্নের পাক শুরু হওয়া— এই হল সমৃদ্ধির স্বরূপ। শুধু এ দেশে বা বৈদিক যুগেই নয়, সর্বত্র সর্বকালেই মানুষ চেয়েছে কিছু খাদ্য অবশিষ্ট থাকতেই পরবর্তী কালের খাদ্যের প্রস্তুতি হওয়া। অর্থাৎ ভাণ্ডার শূন্য হওয়ার পূর্বেই কিছু সংগ্রহ, যাতে ক্ষুধা মানুষকে আক্রমণ করার পূর্বেই তার প্রতিকার বিধান হয়। অর্থাৎ কিছু উদ্বৃত্ত। এই শাস্ত্রাংশে সেই ভাগ্যবানদেরই সমৃদ্ধ বলা হয়েছে যাদের ভাণ্ডার কখনওই শূন্য হয় না, যাদের স্থালী বা হাঁড়ি কখনওই একেবারে খালি হয় না। এই সব উক্তি প্রতিপন্ন করে যে এই অবস্থাটা কাম্য, কিন্তু বাস্তব ছিল না।

যজ্ঞ থেকে খাদ্য পাওয়া যেত এমন ধারণা ছিল, কিন্তু যে বছর যজ্ঞ সম্পাদন করা হত, শস্য সে বছর না-ও জন্মাতে পারত। তাই সে-ই কৃষির প্রথম যুগের রচনা তৈত্তিরীয় সংহিতায় পড়ি, 'যে বছর সত্র হয়, সে বছর প্রজা ক্ষুধার্ত থাকে, তাদের খাদ্য ও বল নিয়ে নেয়; যে বছর অক্ষুধিত, সমৃদ্ধ সে বছর প্রজার অন্ন ও বল নিয়ে নেয় না— যাং সমাং সত্রং ক্ষোধুকাস্তাং সমাং, প্রজা, ইষং হ্যাসামূর্জমাদদতে, যাং সমাং বৃদ্ধমমক্ষোধুকাস্তাং সমাং প্রজা ন হ্যাসামিষমূর্জমাদদতে।' (তৈ/সং; ৮:৫:৯:১) যজ্ঞ করার সঙ্গে সঙ্গেই তো ফসল হয় না, তাই এই সতর্কবাণী; কারণ ও কার্যের মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান তো থাকবেই। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেই যজ্ঞকর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ক্ষুধার সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হচ্ছে, আবার খুব দ্রুত ফললাভের আশা করতে বারণ করাও হচ্ছে। এই সময়টাতেই আর্যরা চাষ শিখেছে, শিখেছে ফসল বোনা ও কাটার মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান থেকেই। সেইটেকেই

যেন যজ্ঞকর্মের ওপরে আরোপ করা হচ্ছে। ক্ষুধিত অবস্থাটা সম্পর্কে কতকটা সহিষ্ণুতাও শেখানো হচ্ছে। ফললাভে বিলম্ব মানুষ যেন ধৈর্য ধরে সইতে পারে এমন উদ্দেশ্যও এতে নিহিত।

ক্ষুধা যে দুঃসহ, সে কথা মানুষ সংগ্রহী (ফলমূল খুঁজে আনা) যুগে এবং শিকারের যুগেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। পশুপালনের যুগে প্রথম অবস্থাটা কতকটা তার আয়ত্তে এল। তখনও নানা দৈব-দুর্বিপাকে পশুপালে মড়ক লাগত, জমির ঘাস খরায় শুকিয়ে যেত, বন্যায় ডুবে যেত, পচে যেত। আশপাশের দস্যুদলের আক্রমণে, লুণ্ঠনে পশুসংখ্যা হ্রাস পেত। তবু এ সব অপেক্ষাকৃত সাময়িক, আগন্তুক উৎপাত। মোটের ওপরে, পালের পশুর দুধ এবং তা থেকে দই, ক্ষীর, ইত্যাদি জুটত এবং পশুমাংসের একটা নিশ্চিত জোগান ছিল। তবু ক্ষুধা জিনিসটা অচেনা ছিল না; অচেনা ছিল তা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার জন্যে আতঙ্ক। ক্ষুধা যদি কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী হত, তাহলে মৃত্যুও হত। চাষ করতে শেখার পর খাদ্যের ব্যাপারে খানিকটা বেশি নিশ্চয়তা এল। তবু তখনও দৈব-দুর্বিপাকে মাঝে-মাঝেই চাষ উঠত না। অনাহার বাস্তবরূপে দেখা দিত। বেশি দিন অনাহারের অর্থ মৃত্যু। তাই সেই ঋগ্বেদের যুগ থেকেই অনাহারের ত্রাস সমাজচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

ক্ষুধাকে বলা হচ্ছে শত্রু। ক্ষুধার উদ্রেকের আগেই খাদ্যসংস্থান করে পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে। 'আমি অন্ন ও বল গ্রহণ করি— এই বলে অন্ন ও বলকে এক দিকে অবরুদ্ধ করে, সে দিকে যে বাস করে সে ক্ষুধার্ত হয়— ইষমূর্জমহমিদমা দদ ইতীষমেবোর্জং তস্মৈ দিশোঽবরুন্ধে, ক্ষোধুকা ভবতি যস্তস্যাং দিশি ভবতি।' (তৈ/সং; ৫:২:৫:৬) 'ক্ষুধাই মৃত্যু— অশনায়া মৃত্যুরেব।' (তৈ/ব্রা; ৩:৯:১৫:৫৭) তখন ক্ষুধার পীড়নে মৃত্যুর কথা অজানা ছিল না, অশনা মানে খাওয়া, কার? যে ক্ষুধিত তার। ('অথাতোঽশনাঽনশনস্যৈব (ব্রতম্)'; (শ/ব্রা ১:১:১:৭) জীবমাত্রেরই ক্ষুধা, এর প্রতিবিধান করার দায়িত্ব সৃষ্টিকর্তার। তাই প্রজাপতির চিন্তা 'কেমন করে আমার সৃষ্ট প্রজারা পরাভূত হচ্ছে?' তখন তিনি দেখলেন, 'ক্ষুধার জন্যে আমার প্রজারা পরাভূত হচ্ছে (এর পর তিনি স্তন্যের ব্যবস্থার জন্য স্তন সৃষ্টি করলেন)— কথং নু মে প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরাভবন্তীতি। স হৈতদেব দদর্শানশনতয়া বৈ মে প্রজাঃ পরাভবন্তীতি।' (শ/ব্রা ২:৫:১:৩) এই যে উপলব্ধি এটা মানুষেরই; প্রজাপতির ওপরে কেবল আরোপিত হয়েছে। ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর আতঙ্ক এত স্পষ্ট ছিল বলেই অন্নের জন্যে এত ব্যাকুলতা। 'একমাত্র ক্ষুধা (রূপ) মৃত্যুই পিছু নেয়... অন্ন দিয়ে ক্ষুধাকে হনন করে— এক উ এব মৃত্যুরন্বেত্যশনায়ৈব... অন্নেনাশনায়াং হন্তি।' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১:১:৩:৩) প্রজাপতির শিথিল দেহের মধ্যভাগ থেকে প্রাণ ওপরে উঠে যেতে চাইল, তাকে (তিনি) অন্নের দ্বারা গ্রহণ করলেন, তাই প্রাণ অন্নের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, যে অন্ন ভোজন করে, সে বেঁচে থাকে; যে অন্ন ভোজন করে সে বীর্যবান হয়।... এই অন্ন প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত দেবতারাই তার পর (অন্ন) লাভ করেন। এ সমস্তের জীবনই হল

অন্ন— প্রজাপতের্বিস্রস্তাৎ প্রাণো মধ্যত উদচিক্রমিষৎ তমন্নেন অগৃহ্নাৎ তস্মাৎ প্রাণো অন্নেন গৃহীতো যো হ্যেবান্নমত্তি স প্রাণিতি স উর্জয়তি। ...তদেতদন্নং প্রপদ্যমানঃ সর্বে দেবা অনুপ্রাপদ্যন্ত অন্নজীবনং হীদং সর্বম্।' (শ/ব্রা ৭:৫:১:১৬-১৮) এর মধ্যে লক্ষণীয় হল ওই কথাটি, 'সকলেই অন্নজীবন' অর্থাৎ অন্নেই বেঁচে থাকে; জীবমাত্রের পক্ষে এ কথা সত্য, তাই অন্নই জীবন। 'তাই যে দেশে ক্ষুধা মানুষকে শীর্ণ করে, সে দেশে মানুষ বুভুক্ষু থাকে— তস্মাদ্ যত্রৈষা যাতযামা ক্রিয়তে তৎ প্রজা অশনায়বো ভবন্তি।' (তা/ম/ব্রা ৬:৪:১২) 'প্রজাপতি অগ্নি নিজের পরিমাণ মতো অন্নের দ্বারা (সৃষ্টি বা জীবকে) প্রীত করেন, যে পরিমাণ অন্ন নিজের জন্য প্রয়োজন তা রক্ষা করে, মানুষের ক্ষতি করে না, তার চেয়ে কম পরিমাণ অন্নে (প্রাণ) রক্ষা হয় না— প্রজাপতিরগ্নিরাত্ম সম্মিতেনৈবেনমেতদন্নেন প্রীণাতি যদু বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ো ন তদবতি।' (শ/ব্রা ৯:২:২:২)

এটিও ওই ব্যাপক ক্ষুধার অন্য একটি প্রকাশ: ক্ষুধার অন্ন পরিমাণে এত কম ছিল যে তাতে প্রাণ রক্ষা হত না; যে অন্ন জীবনের সমার্থক তার অপ্রতুলতার অর্থ আধপেটা বা সিকিপেটা খাওয়া, সে খাওয়া ত নামেই খাওয়া, তাতে পিত্তরক্ষা হয়, প্রাণরক্ষা হয় না। এ অভিজ্ঞতাও পরিচিত ঘটনা ছিল, তাই ক্ষুধার অপর নাম মৃত্যু। দেখা যাচ্ছে, এ বোধে কোথাও কোনও অন্যথা ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকে রচিত এই ব্রাহ্মণগুলি সেই সমাজকেই বর্ণনা করছে যে সমাজে লোহার লাঙলের ফলার ব্যবহারে চাষে কিছু উদ্বৃত্ত হচ্ছে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে সমৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু ক্ষুধারূপ মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে না মানুষ। ব্যাপক এক সন্ত্রাসকে জিইয়ে রেখেছে সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা। সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর আতঙ্কে সন্ত্রস্ত। তার কোনও প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ন দিয়ে ক্ষুধাকে হনন করার কথা বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে। বলা হচ্ছে, অনাহারজনিত মৃত্যুর প্রতিকার হল অন্ন। লোকে এ কথা জানত; সমস্যাটা জ্ঞানের ছিল না, ছিল অন্নের। এ মৃত্যু নিবারণের উপায় জানা থাকলেও সে উপায় অবলম্বন করার সাধ্য অভুক্ত মানুষের ছিল না। 'যে অনাহারে আছে সে যে শেষ খাওয়াটি খায়। এই শেষ খাওয়াটা খায় উপবাসী মানুষ— অনদ্যমানো যদন্তমত্তীতি। অনদ্যমানো হ্যেষা অন্তমত্তীতি।' (জৈ/ব্রা ২:১:২:১)

সমাজে বিপুলসংখ্যক অনাহারী বা অর্ধাহারী না থাকলে যজ্ঞনির্ভর যে সব ধর্মগ্রন্থ তাতে এত অসংখ্যবার 'ক্ষুধাই মৃত্যু' এ কথা উচ্চারিত হত না। প্রকারান্তরে যজ্ঞের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য যে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের খাদ্যসংস্থান করা সে কথাও এ সব বাক্যে স্বীকৃত। সমাজে অন্নাভাব ব্যাপক হলে শাস্ত্র বলে:

> (১) দেবাতারাও অন্নের দ্বারা প্রাণধারণ করেন; (২) প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করে আবিষ্কার করেন তাদের খাদ্য নেই, তাই তারা মারা পড়বে; তখন তিনি (৩) খাদ্য সৃষ্টি করতে উদ্যত হন; (৪) তাঁর সৃষ্ট প্রাণীর প্রাণ বেরিয়ে যেতে উদ্যত দেখে; (৫) তিনি অন্ন দিয়ে তাকে ধরে রাখেন; (৬) এই বৃহৎ বিশ্ব-সৃষ্টি মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিল, সে মৃত্যু ক্ষুধা। অর্থাৎ প্রাণীর

প্রাণধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য ছিল না, তাই সর্বব্যাপী মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ছিল সৃষ্টি। কী তার প্রতিকার? খাদ্য; (৭) সে খাদ্য পর্যাপ্ত হলে তবেই প্রাণীর প্রাণরক্ষা হয়।

কিন্তু সমস্যা হল, তা পর্যাপ্ত নয়, প্রজাপতি যত প্রাণী সৃষ্টি করে ফেলেছেন, তার উপযুক্ত খাদ্য কখনওই জোগাড় হল না।

ক্ষুধার দার্শনিক উচ্চারণ

আগেই দেখেছি, অন্নসংস্থানের প্রত্যেকটি উন্নততর ধাপে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ দেখে প্রচুরতর অন্নের সম্ভাবনা। ক্ষণকালের জন্যে হলেও তার অনাহারে মৃত্যুর ভয় অন্তর্হিত হয়। ফলে জন্মহার বাড়ে। প্রজা বৃদ্ধি হয়। আর ঠিক তার পরেই দেখা যায় প্রজার সংখ্যার সঙ্গে অন্নের পরিমাণের যে সংহতি আশা করা গিয়েছিল, তা নেহাতই মরীচিকা। ক্ষুধা ও খাদ্যের অনুপাত পূর্বের মতো বিসদৃশই থাকে। মানুষের সংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণের কোনও সংগতিই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সেই ব্যাপক ক্ষুধা, সেই অনাহারে মৃত্যুর আতঙ্ক, চাহিদা অনুসারে খাদ্য জোগানের সেই বৈষম্য।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, উন্নততর কৃষিতে যে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হল তা দিয়ে বর্ধিত জনসংখ্যার অন্নসংকুলান হল না কেন? দুটি উত্তর সম্ভব: প্রথমত, যে হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হল তার অনুরূপ পরিমাণে, অর্থাৎ তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে যতটা খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন ছিল ততটা হল না। উল্টো করে বলা যায়, খাদ্য উৎপাদন যতটা বেড়েছে বলে মনে হয়েছিল তাতে প্রজাবৃদ্ধি সম্বন্ধে মানুষের মনে যে আশ্বাস জন্মেছিল, সে-দুটোর মধ্যে একটা ফারাক দেখা গেল। অর্থাৎ খাদ্যবৃদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে মানুষের মনে যে ভরসা জন্মেছিল সেটার সঙ্গে বাস্তবের মিল ছিল না, তাই একটা ভ্রান্ত আশ্বাসে প্রজাবৃদ্ধি ঘটতে লাগল কিন্তু সমাজের খাদ্যভাণ্ডারে সে অনুপাতে খাদ্য মজুত ছিল না। তাই বেদ বলছে:

> মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে যে খাদ্য তা মানুষকে রক্ষা করে, কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য মানুষকে রক্ষা করতে পারে না, অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

এ কথাগুলি একটি বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন: প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য কম, ক্ষুধার অনুপাতে অন্ন নেই, ফলে আধপেটা খেয়ে যখন মানুষ বাঁচে না তখন সেই স্বল্প পরিমাণ খাদ্য প্রাণ রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ প্রলম্বিত অর্ধাহারের পরিণতি অনাহারেরই অনুরূপ। সে-ই অশনায়া, ক্ষুধা, যার অপর নাম মৃত্যু। যে ক্ষুধা-মৃত্যুর দ্বারা সারা সৃষ্টি আবৃত। স্বয়ং প্রজাস্রষ্টা প্রজাপতি যার কিনারা করতে পারেন না। মাঝে মাঝে এটা ওটা নানা যজ্ঞ বাৎলে

দেন, কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি হয় না। একাধিক শাস্ত্রাংশে প্রজাপতিকে যে তাঁর সৃষ্ট মানুষের জন্যে খাদ্যসংস্থানের প্রয়াস পেতে হয়েছে, এতেই প্রমাণ হয় ক্ষুধার কোনও স্থায়ী সমাধান কখনওই হয়নি। ক্ষুধা ও খাদ্যের মধ্যে বৃহৎ একটি ব্যবধান সর্বদাই বিরাজ করেছে, যাকে মানুষ চিনেছে মৃত্যু বলে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য যতটা বেশি উৎপাদিত হয়েছিল উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় তার সবটাই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ক্ষুধিত মানুষের নাগালে আসেনি। অনেকটাই ধনীর লোভকে পুষ্ট করেছে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়েছে। উদরসর্বস্ব কিছু মানুষ লোভের বশে খেয়েছে বেশি। কিছু অন্ন, যা ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারত তা পরিণত হয়েছে সুরায় এবং বিলাসী সুরাপায়ী তাতে নেশা করেছে। অন্নরূপে হোক, সুরারূপে হোক তা পণ্য হয়ে দেশ দেশান্তরে গেছে, অর্থগৃধ্নু বণিকের লোভ চরিতার্থ করেছে। দেশের চারিদিকে অসংখ্য ক্ষুধিত লোক বরাবরই ছিল, তাদের চোখের সামনেই তাদের ক্ষুধার অন্ন শস্যরূপে বা সুরারূপে বিদেশে গেছে, বিত্ত হয়ে ফিরে এসেছে ধনীর হাতে। উদ্বৃত্ত অন্ন আহার করে ধনী তার যৎসামান্য অংশের বিনিময়ে শিল্পী ও শ্রমিকদের দিয়ে প্রয়োজনের ও বিলাসের উপকরণ নির্মাণ করিয়েছে। সেই শিল্পবস্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং নৌবাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর দূরপ্রান্তে চলে গেছে পণ্য হয়ে ধনীর ধন বৃদ্ধি করার জন্যে। বিলাসীর ভোগলালসা চরিতার্থ করবার জন্যে সে খাদ্যশস্য যথার্থ সমভাবে বণ্টন করে হয়তো দেশব্যাপী ক্ষুধা, অনাহার ও অর্ধাহারের এবং তার ফলে অসংখ্য ক্ষুধিতের তিলে তিলে মৃত্যু নিবারণ করা যেত। কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থসর্বস্ব ধনীর কাছে নগণ্য দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষুধা কখনওই এমন তীক্ষ্ণ বাস্তব সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি যাতে লোভের তাড়না দমন করে সে সেই শস্য জনসাধারণের হাতে তুলে দেবে। পৃথিবীতে ক্ষুধার এমন মানবিক সমাধান প্রায়ই ঘটেনি।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ব্রাহ্মণসাহিত্যের বেশির ভাগ রচনার সময় থেকেই জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। এগুলি বেদ ও যজ্ঞকে অস্বীকার করে। এ ছাড়া আরও নানা যে সব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটে সেগুলির তাত্ত্বিক ইতিহাস আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছয়নি। কিন্তু এই সব ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি যে বেদবহির্ভূত ছিল সে কথা জানা যায়। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু অহিংসা, অন্তত যজ্ঞের নামে অধিকসংখ্যক পশু হননের বিরুদ্ধে একটা মত যে গড়ে উঠেছে তা শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের গোহত্যা নিবারণের জন্যে কথাগুলোতে স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মণসাহিত্যই তখন মুখ্য ধর্মগ্রন্থ। নানা শাখায় তখন বহু ব্রাহ্মণ রচনা হচ্ছে। এই ব্রাহ্মণগুলির পরবর্তী অংশ মাঝেমাঝেই আর ব্রাহ্মণ থাকছে না, অন্য এক শ্রেণির সাহিত্যে পরিণত হচ্ছে, যার পরবর্তী কালের প্রতিষ্ঠিত অবস্থান নাম উপনিষদ। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী একটি স্বল্পায়তন সাহিত্য আছে, তার নাম আরণ্যক। সংখ্যায় বেশি নয় কিন্তু যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন আরণ্যকেই প্রথম ধরা পড়ে। এগুলিতে যজ্ঞকে রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করা

হয়েছে। যজ্ঞে ব্যবহৃত তৈজসপত্র (অবশ্য তখন এগুলি কাঠে তৈরি হত, ধাতু দিয়ে বাসন তৈরি আরও পরবর্তী কালের), হব্য, পানীয়, অগ্নি, বেদী এবং আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। যেন যজ্ঞে যে প্রক্রিয়াটা চলছে তার প্রকৃত তাৎপর্য বস্তুজগতের নয়, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জগতের।

আরণ্যকের এই লক্ষণটি থেকে যে নতুন ধরনের ধর্মচিন্তা প্রবর্তিত হল তার পূর্ণতম বিকাশ ঘটল উপনিষদগুলিতে। অবশ্য কালগত ভাবে যেমন ব্রাহ্মণ রচনার শেষ দিকেই আরণ্যক রচনা এবং শেষও হয়, তেমনই বেশ কিছু ব্রাহ্মণের শেষাংশ, আরণ্যক ও কয়েকটি উপনিষদ একই সঙ্গে রচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণের এই শেষাংশ থেকে উপনিষদ পর্যন্ত পুরো যুগের সাহিত্যকে সাধারণ ভাবে জ্ঞানকাণ্ড বলে। এ নামটি উদ্ভাবিত হয়েছে প্রধানত পূর্ববর্তী সংহিতা ব্রাহ্মণের সাহিত্য থেকে এগুলিতে পৃথক ভাবে নির্দেশ করার জন্যে। কর্মকাণ্ড পুরোপুরি যজ্ঞনির্ভর, জ্ঞানকাণ্ডের সাহিত্য এক বিশেষ অর্থে যজ্ঞ নিরপেক্ষ। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞে দেবতাদের স্তব ও হব্য দান করে বিনিময়ে প্রার্থনা করা হত দীর্ঘ আয়ু, স্বাস্থ্য (নিরাময়), শত্রুজয়, পশু ও সন্তান, খাদ্য ও সম্পত্তি— এক কথায় পৃথিবীতে দীর্ঘ সুখী জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা-ই। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে মুখ্য লক্ষ্য হল ঐহিক সুখ। জ্ঞানকাণ্ডে লক্ষ্য বদলে গেল, ঐহিক সুখকে একেবারে অস্বীকার করে নয়, খানিকটা অতিক্রম করে এখন মানুষের লক্ষ্য হল যাতে জন্মান্তর না ঘটে। তত দিনে সমাজে জন্মান্তরবাদ বেশ সুপ্রোথিত এবং এর প্রথম উচ্চারণ 'বারবার জন্ম' নয়, 'বারবার মৃত্যু'। এই মৃত্যুপরম্পরা থেকে নিষ্কৃতিই এখন ধর্মাচরণের প্রধান উদ্দেশ্য বলে গণ্য হল। উদ্দেশ্য যখন বদলেছে তখন উপায়ও বদলে গেল। অর্থাৎ যজ্ঞ দিয়ে তো এ ইষ্ট সিদ্ধ হবে না। এখন ওই জন্মান্তর থেকে নিষ্কৃতি, বৌদ্ধধর্মে যার নাম নির্বাণ এবং উপনিষদ যাকে বলেছে মোক্ষ, তারই জন্যে সাধনা। মোক্ষ যজ্ঞের দ্বারা পাওয়া যায় না; উপনিষদ বলল, মোক্ষ পেতে হলে জানতে হবে ব্রহ্ম আর জীবাত্মা একই। অতএব উপায় এখন জ্ঞান; তাই এ পর্বের নাম জ্ঞানকাণ্ড। যে সব কথা আগে স্পষ্ট করে বলা হয়নি এখন ধীরে ধীরে সেগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হল। ব্যাপারটা ঘটেছেও ধীরে ধীরে, দীর্ঘকাল ধরে— ব্রাহ্মণসাহিত্যেই এই প্রথম লক্ষণগুলি দেখা দেয়। পরে আরণ্যকে যজ্ঞকে প্রতীকী ব্যাখ্যা করে বস্তুজগতের প্রক্রিয়া থেকে আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াতে উন্নীত করার চেষ্টা এবং উপনিষদে স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হল জন্মান্তরের: মৃত্যুতে মানুষের শেষ হয় না, মৃত্যুর পরে মানুষ ভিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যেরূপেই জন্মাক না তার স্বরূপ হল, সে বিশ্বসংসারের কেন্দ্রসত্তা ব্রহ্মের থেকে অচ্ছিন্ন। এই তত্ত্বটিকে সে যখন জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে তখনই সে জন্মান্তর পরম্পরা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে; এ-ই মোক্ষ।

এই পটভূমিকায়, যখন বস্তুজগৎ অপেক্ষাকৃত গৌণ হয়ে যাচ্ছে, যখন মানুষের আত্যন্তিক সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হচ্ছে, তখনকার সাহিত্যে আমরা স্বভাবতই ক্ষুধা ও খাদ্য সম্বন্ধে অন্য ধরনের মনোভাব আশা করতে পারি। এক অর্থে সে আশা পূরণও হয়, কারণ পূর্বের

সংহিতাব্রাহ্মণে যেমন খাদ্যের জন্যে কয়েকশো সরাসরি প্রার্থনা আছে, এ সাহিত্যে ঠিক তেমন নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ওই প্রার্থনাগুলি তো ধর্মসাহিত্যে ছিলই এবং যজ্ঞকালে সেগুলি উচ্চারিত হত। কাজেই ওই সব প্রার্থনা সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে ওই ধরনের প্রার্থনা রচনার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না।

এই কালপর্যায়ে ক্ষুধা ও অন্ন সম্পর্কে মনোভাব কি বদলে গিয়েছিল? উপনিষদে সরাসরি খাদ্যপ্রার্থনা কম, তার একটা কারণ নতুন করে ওই সব প্রার্থনা রচনার প্রয়োজন কমে গিয়েছিল। পুরনো প্রার্থনা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান তখনও চালু ছিল, অতএব ওই সব প্রার্থনা যজ্ঞের প্রসঙ্গে উচ্চারিত হতই এবং খাদ্যলাভের জন্যে নির্দিষ্ট যজ্ঞগুলিও নিয়মিত ভাবে সম্পাদিত হত। দ্বিতীয় কারণ হল, ওই সব প্রার্থনা দিয়ে খাদ্যলাভ করা যায়, এ বিশ্বাস হয়তো খানিকটা শিথিল হয়েছিল, কারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেবতাদের কাছে নিয়মিত অন্নভিক্ষা করেও সমাজে অভুক্ত মানুষের সংখ্যা কমল না, ক্ষুধার সমাধান হল না। এ কথা সংহিতাব্রাহ্মণের পরে আরও কয়েকশো বছর ধরে ত মানুষ চোখেই দেখতে পেল। ফলে যজ্ঞ ও প্রার্থনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস আর তত দৃঢ় থাকা সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত, আরণ্যক রচনার কালে ওই যে সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি যজ্ঞ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, অথচ তাদের ক্ষুধার পরিমাণ যে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের চেয়ে কম ছিল না তা তো অভিজ্ঞতাতেই ধরা পড়েছিল। যে কোনও উপায়ে যজ্ঞ না করেও তাদের যেমন তেমন করে খিদে তো মিটছিল? চতুর্থত, লোহার লাঙলের ফলার প্রচলনের পর চাষে যে ফসল উদ্বৃত্ত হচ্ছিল তা মানুষ প্রত্যক্ষ জানছিল। তারই সঙ্গে এ-ও দেখছিল যে সে-উদ্বৃত্ত ফসলে সমাজে পরিব্যাপ্ত ক্ষুধার নিবারণ হচ্ছিল না: সে-উদ্বৃত্ত ভোগে লাগছিল মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীর বাসনা ও লোভ চরিতার্থ করতে। কাজেই দেবতার কাছে খাদ্য চেয়ে আর কী-ই বা লাভ হবে? তা ছাড়া, ওই খাদ্য প্রার্থনা তো যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত, এবং সপ্তম শতকের পরে আর্যাবর্তের ধর্মজগতে যে বাতাস বইছিল তা যজ্ঞের প্রতিকূলে। নতুন ধর্মসম্প্রদায়গুলি সবই যজ্ঞবিরোধী, কাজেই যজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে প্রার্থনা তাতে লোকের আস্থা খানিকটা টলে গিয়েছিল।

তার ওপরে তখনকার প্রবল একটি মত ছিল আজীবিকদের মত; এরা নিয়তিবাদের প্রবক্তা। এদের মতে সংসারে কোনও কিছুই কার্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত নয়, অতএব কোনও কিছুরই কোনও বিধিসঙ্গত প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। শুধু যে যজ্ঞ করে কিছু হয় না তা নয়, জ্ঞান দিয়েও, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েও জন্মান্তর ঠেকানো যায় না। কয়েক লক্ষ বার পুনর্জন্ম হওয়ার পর আপনিই তা বন্ধ হয়ে যায়। নিয়তিবাদ যে সমাজে প্রবল, সেখানে খাদ্য সম্বন্ধে প্রার্থনাও যেমন নিষ্ফল, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত যজ্ঞও তেমনই অর্থহীন। অবশ্য সে-সমাজে নিয়তিবাদই একমাত্র তত্ত্ব ছিল না। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধরাও যজ্ঞে সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিল, অন্যান্য ছোটবড় সম্প্রদায়ও যজ্ঞ সম্বন্ধে উদাসীন ও অবিশ্বাসী ছিল। এতগুলি প্রস্থান যেখানে যজ্ঞ বিষয়ে নিরুৎসুক, সেখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেবতাদের কাছে খাদ্যভিক্ষা কতটা কার্যকরী হবে সে

সম্বন্ধে বহু মানুষই ক্রমাগত সন্দিহান হয়ে পড়ছিল। এ সব মনে রাখলে বোঝা যায়, বাহুল্যবোধে ও নিষ্ফল জেনে মানুষ পূর্বের মতো যজ্ঞ করে দেবতাদের কাছে নিজেদের অন্নাভাব নিবেদন করে খাদ্যলাভের আশা করতে সাহস পাচ্ছিল না। কাজেই জ্ঞানকাণ্ডের সাহিত্যে সরাসরি খাদ্যভিক্ষা কমে গিয়েছিল। যদিও তার দ্বারা কোনও মতেই এটা প্রমাণ করা যায় না যে, সমাজে অন্নের প্রাচুর্য ছিল অথবা ক্ষুধা প্রশমিত হয়েছিল।

অন্ন ব্রহ্ম

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের বহু কথাই উপনিষদে আবার বলা হয়েছে। তেমনই বৃহদারণ্যক উপনিষদে শুনি, 'প্রথমে এখানে (এই বিশ্বভুবনে) কিছুই ছিল না, এ সব মৃত্যু দিয়ে আবৃত ছিল। ক্ষুধা দিয়ে, ক্ষুধাই মৃত্যু— নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যু নৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াঽশনায়া হি মৃত্যুঃ।' (২:২:১) এ কথা ব্রাহ্মণসাহিত্যে বহুবার শুনেছি, এখন উপনিষদেও শোনা যাচ্ছে। অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ তো সরাসরি শতপথব্রাহ্মণেরই শেষাংশ। ব্রাহ্মণসাহিত্যই যেন বিবর্তিত হয়েছে উপনিষদে, কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেই প্রসঙ্গে আগের মতোই শোনা যায়, 'অন্ন থেকে বীর্য— অন্নাদ্বীর্যম্।' (প্রশ্ন উপ. ৬:৪) এ যেন ব্রাহ্মণসাহিত্যেরই অনুবৃত্তি, চেনা কথার পুনরুচ্চারণ। ছান্দোগ্য বলে, 'যে কুলে (বৃহৎ যৌথ পরিবারে) এই আত্মা বৈশ্বানর (অগ্নি)-কে উপাসনা করা হয়, সেখানে (লোকে) অন্ন আহার করে, শ্রী'র দেখা পায়, তার ব্রহ্মদীপ্তি আসে— অত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসম্। কুলে য এতমেবাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে।' (ছা/উ ৫:১২:২; ৫:১৩:২; ৫:১৪:২; ৫:১৫:২) এই ধরনের কথাই শুনি অন্যত্র: 'মহ হল অন্ন। অন্নের দ্বারাই সকল প্রাণ মহিমান্বিত হয়— মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে।' (তৈত্তিরীয় উপ. ১:৫:৩) হঠাৎ শুনলে কেমন অবাক লাগে, উপনিষদের যুগে— যখন আধ্যাত্মিকতাই জয়যুক্ত, যখন ব্রহ্মই পরম সত্য— তখন নেহাৎ তুচ্ছ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নকে এই গৌরব দেওয়া হচ্ছে: 'অন্নের দ্বারা সকল প্রাণ মহিমান্বিত হয়।' যত দিন গেছে ততই মানুষ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে বুঝতে পেরেছে উচ্চ কোটির দার্শনিক চিন্তা গৌরবের বস্তু হলেও সে চিন্তার আধার যে শরীরটা, তাকে বাঁচিয়ে রাখে অন্নই, কাজেই চিন্তার মহিমা অন্নের ওপরে একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল, এ অন্ন 'মহ', মহৎ, এর মধ্যে নিহিত প্রাণের মহিমা। 'অন্নেই এই সমস্ত প্রাণী নিহিত— অন্নে হীমানি সর্বানি ভূতানি বিষ্টানি।' (বৃ/আ/উ ৫:১১:১) সমস্ত প্রাণীর আধারভূত অন্ন, অন্ন বিনা প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারে না, আর জীবনই যদি বিপন্ন হয় ত উচ্চ চিন্তা তো নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। কাজেই এদের মুক্তদৃষ্টিতে অন্নের তত্ত্বটি খাঁটি ভাবেই ধরা দিয়েছিল। অন্য রকম চিন্তাও ছিল, কিন্তু এই ধরনের নির্মোহ দৃষ্টিও ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের; সামবেদ যজ্ঞের গানের সংকলন। সামগানের একজন গায়কের পারিভাষিক নাম 'প্রতিহর্তা'। ছান্দোগ্য ওই প্রতিহর্তার প্রতিহরণ কর্মটির একটা অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলছে, 'এই সব প্রাণীই অন্ন প্রতিহরণ (সংগ্রহ) করে বেঁচে থাকে। এই দেবতাটি প্রতিহারের অধীন— সর্বাণি হ ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা।' (ছা/উ ১:১০:৯) আচার্য শিষ্যকে বলছেন 'হে সৌম্য, মন হল অন্নময়— অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।' (ছা/উ ৬:৫:৪) এখানে মনে করতে হবে যে উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই জ্ঞানকাণ্ডের যুগে মন ও দেহের ব্যবধানটা নানা ভাবে উপলব্ধ ও স্বীকৃত হচ্ছে। তার একটা প্রকাশ হল, কায়িক শ্রমকে তখন নিচু চোখে দেখা হচ্ছে, সমাজে শ্রেণিবিভাজন হয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে, এবং উচ্চতর শ্রেণির সংজ্ঞা হল: সে হাতপায়ে খাটে না, মাথা দিয়ে পরিশ্রম করে এবং সমাজে সে অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, পুরোহিত, শাস্ত্রকার ও সমাজপতিরা রাজা ও রাজন্যের প্রসাদপুষ্ট। অতএব এরা উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত নয়, এরা বুদ্ধি দিয়ে মতবাদ ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, দিনপাতের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্ন এদের তারাই জোগায় যারা উৎপাদন করে— সেই চাষি ও মজুররা। পরান্নজীবী এই শ্রেণিটিও কিন্তু এ বিষয়ে অবহিত যে যে-অন্ন তারা উৎপাদন করে না বটে কিন্তু আহার করে। সে-অন্ন দুঃস্থশ্রেণি কায়ক্লেশে উৎপাদন করে এবং সে-অন্ন না হলে উচ্চমার্গের চিন্তা করার সামর্থ্যই এদের থাকত না। যখন অন্ন-উৎপাদক সমাজে নিচের তলার নাগরিক, সামাজিক সংবিধানে সব রকমে অধিকারচ্যুত, তখনও প্রথম শ্রেণির নাগরিকরা, যারা এই শাস্ত্র রচনা করছে, তারা অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করছে যে, অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।

অন্ন মহৎ, প্রাণি-মাত্রকেই জীবনধারণের জন্য অন্নের উপর ভরসা করতে হয়, কারণ অন্ন বিনা প্রাণরক্ষাই হয় না। তাই এদের বলতে হয় যে, ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্য কে যে অবধারণ করবে অর্থাৎ জানবে সেই মন হল অন্নময়। এবং অন্নের এই মহিমার স্বীকৃতি নানা ভাষায়; আর এর স্বীকারের পিছনে আছে তার দুষ্প্রাপ্যতা। অন্ন সহজলভ্য হলে তার এত মহিমা কীর্তন থাকত না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ খুব খোলাখুলি ভাবে বলেছে, 'অন্ন বিনা প্রাণ শুকিয়ে যায়— শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেহন্নাৎ।' (বৃ/আ/উ ৫:১২:১) অন্নের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'অন্ন বলের চেয়ে অধিক... অন্নকে যে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করে সে অন্নবান, পানীয়বান লোকে প্রতিষ্ঠিত হয়— অন্নং বাব বলাদ্ভূয়ঃ... যোহন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেহন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোৎভিসিধ্যাত।' (ছা/উ ৭:৯:১) এখানে প্রণিধান করবার মতো কথাটা হল, 'অন্নকে যে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করে।' উপনিষদে মাঝে মাঝেই অনেক বস্তুকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, যেমন প্রাণ, মন, ইত্যাদি। এগুলি দার্শনিক তত্ত্বের উপাদান, ব্রহ্মের কল্পনা থেকে দূরে নয়। কিন্তু অন্ন? সে যে নেহাতই স্থূল বস্তুজগতের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সাদামাটা বস্তু। ধর্ম, দর্শন, ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে বহু যোজন দূরে তার অবস্থান। সেই অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করার কথা বলা হল। যে তা করে সে অন্ন, পানীয় লাভ করে। সহজেই মনে আসে,

অশনায়াপিপাসে'র কথা, যার অপর নাম মৃত্যু। অর্থাৎ অন্নকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করলে অন্ন ও পানীয়ের অভাব ঘটে না, অতএব মৃত্যুকে পরাস্ত করা যায়। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হল 'উপাসনা করা': অন্নকে উপাসনা করার কথা অসংকোচে উচ্চারিত হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে কর্মকাণ্ডে উপাস্য ছিলেন ইন্দ্র, সূর্য, আদি দেবতারা। যজ্ঞে তাঁদের উদ্দেশে হবিঃ সমর্পণ করে তাদের স্তব করাই ছিল তখনকার উপাসনা। তার থেকে নানা ফল প্রত্যাশিত ছিল, এগুলির মধ্যে অন্ন-পানীয়ও ছিল। কর্মকাণ্ডের যজ্ঞনির্ভর উপাসনার যে ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল, জ্ঞানকাণ্ডে যজ্ঞ যখন বাহুল্য বা নিষ্প্রয়োজন বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, যখন উদ্দেশ্য হল ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি, তখন উপাস্য কী? অন্ন। কেমন ভাবে? ব্রহ্মরূপে। এ ব্রহ্ম হল বেদের কর্মকাণ্ডের দেবতাদের ঊর্ধ্বে এক পরম তত্ত্ব। তার বাস্তব রূপ হল অন্ন, প্রতীকী অর্থে নয়, ব্রহ্ম এখানে অন্নের সঙ্গে অভিন্নরূপে সমীকৃত। এই কথাই পড়ি অন্যত্র: 'অন্নকে ব্রহ্ম বলে' জানলেন। অন্ন থেকেই প্রাণীরা জাত হয়, অন্ন দিয়েই জাত প্রাণীরা বেঁচে থাকে। অন্নে প্রবিষ্ট হয়ে প্রাণীরা লীন হয়ে যায়— অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।' (তৈ/উ ৩:২:১-৩) সামান্য পৃথক ভাবে বলা হয়েছে, 'অন্ন থেকে প্রজারা জন্মায় যারা এ পৃথিবীতে আশ্রিত; তার পর অন্ন দ্বারাই প্রাণীরা বেঁচে থাকে। অন্নই প্রাণীদের জ্যেষ্ঠ। অন্ন থেকে প্রাণীরা জন্মায়। প্রাণীরা ভোজন করে ও ভুক্ত হয় তাই অন্নকে অন্ন বলে— অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীংশ্রিতাঃ... অথো অন্নেনৈব জীবন্তি... অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জতান্যন্নেন জীবন্তি। অদ্যতে অত্তি ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে।' (তৈ/উ ২:২:১-৩) দুটি শাস্ত্রাংশের মধ্যে পার্থক্য বেশি নেই, একটিতে প্রজার উল্লেখ আছে, অন্যটিতে প্রাণী বলা হয়েছে; প্রজাপতির প্রজাই হল প্রাণী। যে বাগ্‌ভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি লক্ষণীয়। এর আদিকল্পটি হল 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।' এই আনন্দব্রহ্মের স্বরূপ হল: তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। এই বারে লক্ষ্য করি ব্রহ্মবাচক আনন্দ পদটিরই জায়গায় 'অন্ন' ব্যবহার করা হয়েছে। তা হলে ব্রহ্ম আর অন্ন স্পষ্টতই সমার্থক, অন্নই ব্রহ্ম এই কথাটাকেই এই ভাবে শব্দ বিপর্যাসের দ্বারা আরও স্পষ্ট করে বলা হল। এর ফলে অন্নব্রহ্ম তত্ত্বটি আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এইখানে সেইটেই উদ্দিষ্ট।

মনে রাখতে হবে, এই যুগে ব্রহ্মের কল্পনাও নতুন। কর্মকাণ্ডে ব্রহ্মা একজন দেবতা, পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতির মতোই একজন প্রধান দেবতা— প্রায়শই বিমূর্ত ভাবে কল্পিত। উপনিষদের ব্রহ্ম কিন্তু সে রকম দেবতা নন। পরবর্তী বেদান্ত সাহিত্যে ব্রহ্ম পদার্থ ও শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। উপনিষদে ঠিক তা নয়, তবে তার সূচনা এখানে দেখা যায়। ব্রহ্মের মধ্যে দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে যে সর্বাতিগ, সর্বাতিশায়ী শ্রেষ্ঠ একটি সত্তা কল্পনা করা হয়েছে, এ সব শাস্ত্রে বলা হচ্ছে অন্ন, সে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। সৃষ্টির মধ্যে, প্রাণীদের মধ্যে অন্ন জ্যেষ্ঠ— সেটাও অন্নের মহিমাই সূচিত করে। এই জ্যেষ্ঠত্বের উল্লেখ করা হচ্ছে, কারণ

ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উপাখ্যানে আছে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করার পরে প্রজারা খুব ক্লিষ্ট হল ক্ষুধায়, তখন প্রজাপতি তাদের জন্যে খাদ্য সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির এই ক্রমকে বিপর্যাসের মধ্যে ফেলে অন্নকে সৃষ্টির জ্যেষ্ঠ বলা হচ্ছে, কারণ অন্নহীন বিশ্বে প্রাণী থাকা সম্ভব নয়, তাই অন্নকে আদি সৃষ্টি বলা হয়েছে। আর সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে একে অপরকে যে খায় সে তো জানা কথা তাই 'অদ্যতে', 'অত্তি'। অদ্ ধাতু নিষ্পন্ন এই দুটি শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে 'অন্ন' শব্দের ব্যুৎপত্তি বলা হল। অন্ন হল সেই বস্তু যাকে কিছু প্রাণী খায় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অন্য প্রাণীর দ্বারা ভক্ষিতও হয়। যেমন তৃণভোজী প্রাণী মাংসাশী প্রাণীর খাদ্য, ছোট মাছ বড় মাছের খাদ্য, বহু কীটপতঙ্গ ও মাছ অনেক পাখির খাদ্য। এই সব পরস্পরের 'অদন' বা খাওয়ার ভিত্তিতেই সৃষ্টিতে বিভিন্ন জীবের আহার সংস্থান চলছে। এই বিরাট, ব্যাপ্ত ও জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে সৃষ্ট প্রাণীদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটছে। তাই মনে হয়, একটি ব্যাপক অর্থে অন্ন ব্রহ্ম। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আহার একটি অপরিহার্য ব্যাপার, যার উল্টোদিকে আছে অনাহার ও মৃত্যু, তাই অন্ন জীবন। অন্নই ব্রহ্ম।

কৃষিপ্রধান দেশে ফসল জলের ওপরে একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। তাই শুনি প্রজাপতি বলছেন:

> প্রজার জন্যে আমি বহু হব। (তিনি) জল দেখলেন জল (বলল) বহু হব, প্রজার জন্ম দেব। জল তখন অন্ন সৃষ্টি করল, তাই যে কোনও জায়গায় বৃষ্টি হয় সেখানেই প্রচুর অন্ন (হয়) তাই জল থেকে আহার্য অন্ন উৎপন্ন হয়।— তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক্ক বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদান্নাদ্যং জায়তে। (ছান্দোগ্য উপ ৬:২:৪)

সিন্ধুসভ্যতায় যে সেচ ব্যবস্থা ছিল, আর্যরা এ দেশে আসবার পরে তার অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছিল, ফলে প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কৃষি বৃষ্টিনির্ভর। জল থেকে অন্ন, সেই অন্ন প্রজার জীবন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছে:

> অন্নকে নিন্দা করবে না। তাই বেঁচে থাকার অবলম্বন (ব্রত)। প্রাণই অন্ন। শরীর হল অন্নভোজী।... তাই এই অন্ন অন্নে প্রতিষ্ঠিত— অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্।... তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। (তৈ/উ ৩:৭)

শরীর বেঁচে থাকে প্রাণে, প্রাণের অবলম্বন অন্ন, অন্ন জীবনকে রক্ষা করে, তাই অন্নকে নিন্দা করবে না। তার মানে অন্নকে নিন্দা করার প্রসঙ্গ কিছু হয়তো ছিল। অর্থাৎ প্রাগার্য বা অপরিচিত জনগোষ্ঠীর কিছু খাদ্যকে হয়তো আগন্তুক আর্যরা তাচ্ছিল্য করত; হীন, অখাদ্য মনে করত। কিন্তু যে সমাজে ব্যাপক খাদ্যাভাব, সেখানে কোনও রকম খাদ্যের নিন্দা করা বা তাকে পরিহার করা প্রকারান্তরে আত্মঘাতী। এ সম্বন্ধে পরে দেখতে পাব যে আপৎকালে শুচি অন্ন ও অশুচি অন্নের বোধ কেমন করে ভেঙে যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা কোনও বিপর্যয়ে যখন পরিচিত, অভ্যস্ত অন্ন দুর্লভ হত, তখন মানুষ অনভ্যস্ত খাদ্য দিয়েই উদরপূর্তি করতে বাধ্য হত। এবং তখন সে-'অখাদ্য' শুধু খাদ্য হয়েই উঠত না,

প্রাণরূপে দেখা দিতে। যার অপর পিঠে আছে বুভুক্ষা, অশনায়া, যার অন্য নাম মৃত্যু। কাজেই শরীরকে যে বাঁচিয়ে রাখে, শরীরে প্রাণকে সেই আশ্রয় দেয়, অন্নের নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ, তা অপরিহার্য, তা যে-রূপেই দেখা দিক না কেন। অতএব এই ব্রহ্মতত্ত্বের যুগে, জ্ঞানকাণ্ডের এই উপনিষদের যুগে তাকে চূড়ান্ত সম্মান দিতে গেলে তাকে ব্রহ্ম বলতে হয়, সৃষ্টির ওপারের পরমতত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখতে হয়। আমরা দেখেছি কর্মকাণ্ডের যজ্ঞের যুগে অন্নকে নানা দেবতার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছিল। সে যুগে দেবতারাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রতীক। এখন সেখানে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিপাদক ব্রহ্ম, তাই অন্ন এখন ব্রহ্ম। তাই যে-কেউ অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে তার কখনও অন্নাভাব হয় না, এমন কথা বারে বারেই শোনা গেছে।

মৃত্যুকালে পিতা পুত্রকে তাঁর সব কিছু উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়ে যেতেন। একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পিতা পুত্রকে তাঁর ইন্দ্রিয়, মন, শক্তি, ধন ইত্যাদি দান করতেন। এই প্রসঙ্গে বলতেন, 'আমার অন্নরস তোমাতে নিহিত করছি... আমার যশ, ব্রহ্মবর্চস, আহার কীর্তি তোমার সেবা করুক— অন্নরসাম্মে ত্বয়ি দধামীতি পিতা... যশো ব্রহ্মবর্চসম্ অন্নাদ্যম্ কীর্তিঃ ত্বা জুষতামিতি।' (কৌষীতকি উপ. ২:২২) পিতা যখন পুত্রকে অন্নরস উত্তরাধিকার সূত্রে সমর্পণ করেন তখন সম্ভবত অন্নরস গ্রহণ করে তাঁর শরীরে যে পুষ্টি, শক্তি, স্বাস্থ্য, তেজ ও পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছিল সে সবই ছেলেকে দিয়ে যেতে চান। এ ছাড়াও তিনি বলেন আমার 'অন্নাহার' তোমাকে দিলাম। অর্থাৎ ক্ষুধা নিরসনের জন্যে আমি যে খেতে পেতাম, সেই ক্ষুধা নিবারণের অধিকার তোমাকে দিলাম। এ বড় কম দেওয়া নয়, যে সমাজে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য কম, যেখানে সকলে খেতে পায় না, যারা পায় তারাও নিয়মিত পায় না, প্রয়োজনের তুলনায় কম পায়, সেই সমাজে খেতে পাওয়ার উত্তরাধিকার পুত্রকে অর্পণ করা একটি তাৎপর্যপূর্ণ দান। পিতা হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালের পিতার মতো এ পিতাও কামনা করছেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' কামনা কামনাই, এ-দান ইচ্ছাপূরক দান; যশস্বী পিতার পুত্র অনেক সময়েই অপযশস্বী হয়, কাজেই পিতা দিতে চাইলেই যে পুত্র যশ, তেজ, কীর্তি লাভ করবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই; ঠিক তেমনই অন্নাহারে অধিকারও যে পিতার অভিলাষ বলেই পুত্র পাবে তারও ঠিক নেই। অন্নাহারের অধিকার যথেষ্ট ধনী পিতাই হয়তো পুত্রের জন্যে নিশ্চিত ভাবে দান করে যেতে পারবে। কিন্তু এ কামনা সব পিতারই থাকবে এবং এর একটা তীক্ষ্ণতা আছে, এই কারণে যে, সমাজে খাদ্যাভাব ছিল।

সৃষ্টির একটি উপাখ্যানে পড়ি, '(প্রজাপতিকে) ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বলল, আমাদের জন্য আধার নির্দিষ্ট করুন, (প্রজাপতি) বললেন, এই দেবতাদের মধ্যে তোমাদের ভাগ বিধান করব। তাই যে কোনও দেবতাকেই হবির্দান করা হোক না কেন, তাঁরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ভাগী হয়— তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম আবাভ্যামভি প্রজানীহীতি। স তেঽব্রবীৎ এতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতাউয় হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যোবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ।' (ঐতরেয় উপ ১:২:৫) এই অংশে যা প্রথমেই

দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল, ক্ষুধাতৃষ্ণা তো মানুষের চিরশত্রু, প্রজাপতি তাদের প্রশ্নের উত্তরে তো বলতে পারতেন, 'মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে তোমাদের স্থায়ী আবাস নিরূপণ করছি।' বললে সেটা সহ্যও হত, মানুষের অভিজ্ঞতায় নির্ভরযোগ্য বলেও প্রতিপন্ন হত। তা না বলে প্রজাপতি এমন একটা উত্তর দিলেন যার সপক্ষে কোনও প্রমাণই নেই: কেউ কোনও দিন জানতে পারবে না দেবতা আছেন কিনা এবং থাকলে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে কিনা। তবু প্রজাপতি কেন এমন উত্তর দিলেন? এ জন্য যে, এতে সহজ একটা সমাধান হল, তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণাকে দেবতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে ক্ষুধাতৃষ্ণার গুরুত্ব বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞেরও; কারণ, যজ্ঞে উৎসর্গ করা খাদ্যপানীয় দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করে। কিন্তু যজ্ঞ ত হচ্ছিলই, এ শাস্ত্রাংশে আরও যেটা প্রতিপন্ন হল তা হল ক্ষুধাতৃষ্ণার আক্রমণ থেকে দেবতারাও অব্যাহতি পান না, ক্ষুধাতৃষ্ণার এতই অপ্রতিহত শক্তি। শুধু তাই নয়, এ বিধান স্বয়ং প্রজাপতিরই, তিনিই ক্ষুধাতৃষ্ণাকে দেবতাদের দেহে স্থাপন করেছেন। স্বভাবতই মানুষ ভাববে, স্বয়ং দেবতারাই যখন ক্ষুধাতৃষ্ণার আক্রমণ থেকে মুক্ত নন, তখন সমাজে যে ব্যাপক অপ্রতিকার্য ক্ষুধা, তাকে মানুষ গুরুত্ব দেবে, এই বুঝে যে দেবতাদেরও ক্ষুধা আছে। মানুষ যজ্ঞ না করলে তাঁরাও অভুক্ত থাকেন। তা ছাড়া ক্ষুধার মহিমাও প্রচার করা হচ্ছে এই ভাবে, যেন প্রয়োজন হলে মানুষ সহিষ্ণু ভাবে মেনে নেয়, মনে করে দেবতারাও যে কষ্টে পীড়িত হন, আমার পক্ষে তা সহ্য করা কী আর এমন ব্যাপার!

কিন্তু অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'দেবতারা আহারও করেন না, পানও করেন না। শুধুমাত্র এই অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন— ন বৈ দেবা অশ্নান্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্টা তৃপ্যন্তি।' (ছা/উ ৩:৬:১) তবে? তবে কেন বলা হল, প্রজাপতি ক্ষুধাতৃষ্ণাকে দেবতাদের শরীরে স্থাপন করলেন? লক্ষ করলে দেখব, এ শাস্ত্র একবারও বলছে না যে দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ হয় না। বরং ক্ষুধাতৃষ্ণার পরিপ্রেক্ষিতেই যেন বলা হচ্ছে, যখন দেবতারা ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ করেন তখনও মানুষের মতো খাদ্যপানীয় দিয়ে তাঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণার নিরসন করেন না। তাঁরা অমৃত দেখেই তৃপ্ত হন। অর্থাৎ অমৃতের দর্শনেই তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা তৃপ্ত হয়। কিন্তু যজ্ঞে তো অমৃত কখনও নৈবেদ্য দেওয়া হয় না, হব্য পানীয়ই দেওয়া হয়। দেবতাদের অমৃত দেবলোকেরই ব্যাপার, সেখানেই তা কোনও ভাবে সংগৃহীত হয় তাঁদের জন্যে। এ শাস্ত্রে মানুষ তার প্রয়োজনীয় যে খবরটা পেল তা হল যজ্ঞে যে নৈবেদ্য, খাদ্য, পানীয় দেওয়া হয় দেবতারা তা দিয়ে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেন না, তাই অগ্নিদগ্ধ নৈবেদ্যের ধূম ঊর্ধ্বদিকে চলে যায়, ভস্ম নীচে পড়ে থাকে। এটা না বললে যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে ভক্ষ্য ও পেয় দেওয়া অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং তা হলে ওই আগের কথা— প্রজাপতি দেবতাদের দেহে ক্ষুধাতৃষ্ণা স্থাপন করলেন— এটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হল, প্রজাপতির বিধানে দেবতাদেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা অবশ্যই আছে, কিন্তু মানুষের দেওয়া খাদ্যপানীয়ে তা নিবৃত্ত হয় না, হয় অমৃতে। দেবতাদের দেবলোক যেহেতু সম্পূর্ণ ভাবেই মানুষের অগোচরে, তাই সেখানে কীভাবে অমৃতের সংস্থান হয় কীভাবে তা দর্শনমাত্রেই

দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা অন্তর্হিত হয়, তার কোনও ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়নি। লক্ষণীয়, দেবতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা যাতে মেটে তার নাম 'অমৃত'। সার্থক নাম, কারণ ক্ষুধাতৃষ্ণা, অশনায়াপিপাসের অপর নাম মৃত্যু। মৃত্যু থেকে দেবতাদের যা বাঁচায় তা অমৃত। যার দর্শনমাত্রই ক্ষুধাপিপাসা মিলিয়ে যায়।

অন্ন কার জন্যে? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় শরীরের জন্য। উপনিষদ্ একটু এগিয়ে গিয়ে বলছে, প্রাণের জন্যে। 'কুকুর থেকে শুরু করে শকুনি পর্যন্ত এই যা কিছু... তা সবই এর (প্রাণের) অন্ন— যৎ কিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্যঃ... এতাবানস্যান্নম্।' (ছা/উ ৫:২:১) কুকুর ও শকুনির উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, আরও এই কারণে যে, এ সব কিছুকে শরীরের অন্ন বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে প্রাণের অন্ন। অর্থাৎ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যখন অন্য ভদ্রতর গ্রাহ্যতার কোনও খাদ্য জুটছে না তখন শুধু প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই যে কোনও হীন খাদ্য, কুকুর-শকুনির মাংস যা স্বাভাবিক অবস্থায় ভদ্র মানুষের খাদ্যতালিকার মধ্যে থাকে না, আপৎকালিক সেই খাদ্যই প্রাণকে বাঁচায়। এর চেয়ে বড় তাগিদ প্রাণীর আর নেই।

মাঝে মাঝেই শুনছি, 'যে এ কথা জানে', যেমন, '(বিরাজ ছন্দ) দ্বারা, সে অন্নাহারী হয়, এ সকলই তার দৃষ্ট হয়, তার দৃষ্ট সবই তার অন্নাহার (-এ পরিণত) হয়, যে এ কথা জানে— অন্নাদী তয়েদং সর্বং দৃষ্ট সর্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।' (ছা/উ ৪:৩:৮ মাণ্ডুক্য উপ ১:৩:৬) 'যে এ কথা জানে' এই বাক্যাংশ দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে শুধু পরিচ্ছেদ শেষ হওয়ার সূচনা জানাতে নয়, এর গুরুত্ব বোঝাতেও। গুরুত্ব কেন? এটা উপনিষদের যুগ; কর্মকাণ্ডের যুগে যজ্ঞ সম্পাদন করলেই তার দ্বারা অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস ছিল। এখন লক্ষ্য চলে গেছে পার্থিব কাম্য বস্তুর ওপারে— মোক্ষে, নির্বাণে, ব্রহ্মে লয় হওয়ার। এবং তার উপায় আর যজ্ঞ নয় জ্ঞান; ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভিন্নতার জ্ঞান; মানুষকে জানতে হবে তার বিচ্ছিন্ন সত্তাটা আপেক্ষিক সত্য, পরম সত্য হল সে বিচ্ছিন্ন নয়, পরমাত্মারই রূপভেদ মাত্র। অতএব এখন কর্মকাণ্ডের দ্বারা সভ্য যা কাঙ্ক্ষিত বস্তু, যেমন অন্ন, বা অন্নাহারী হওয়া সেটিও পাওয়ার উপায়, এ তত্ত্ব 'জানা'। তাই যে এই কথা জানে সে অন্নাহারী হয়। অর্থাৎ পূর্বে যা যজ্ঞের দ্বারা সিদ্ধ হত এখন সেটা ঘটবে 'জানা'র দ্বারা। এর মধ্যে বিরাজ ছন্দের যজ্ঞীয় মাহাত্ম্যও কীর্তিত হল, আবার যজ্ঞোত্তর জ্ঞানমার্গেরও মহিমা ঘোষিত হল। অর্থাৎ এ এমন একটা যুগ যখন, যজ্ঞ চলছে বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্যসমাজে এবং তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও চলছে উপান্তের আরণ্যসমাজের নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এরা বিভিন্ন মতের, কিন্তু কেউই বেদ বা যজ্ঞকে স্বীকার করে না। এদের সব মতই বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেওয়ার, কাজেই ব্যাপক এক অর্থে এরা এখন সারা দেশে পরিব্যাপ্ত যে জ্ঞানকাণ্ড তারই অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের বহির্বাণিজ্য যখন মিশর, চিন, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইয়োরোপের দক্ষিণ প্রান্তে আনাগোনা করছে তখন ওই সব অঞ্চল থেকে নানা ভাবধারাও এখানে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দী তেমনই একটা সময়, যখন ভারতবর্ষের বাইরে ওই সব অঞ্চলেই,

চিন্তা-বিশ্বাস-ধর্ম- দর্শনের জগতে একটা প্রবল আলোড়ন চলছে এবং সে-সবটাই মূলত বুদ্ধির পরিধিতে। জানার পরিধি, গভীরতা, বৈচিত্র্য সম্বন্ধে, জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে একটা অস্থিরতা, ব্যাকুলতা এই বৃহৎ অঞ্চলকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। তারই ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতবর্ষের চিন্তাজগতের তটেও। তাই এখন বৈদিক এবং বেদবিরোধী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'জানা'-ই হয়েছে মুখ্য। এখন যজ্ঞ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার পর্ব হয়েছে গৌণ, জ্ঞান দিয়ে 'জেনে' লাভ করাই হয়েছে উপায়।

জৈমিনীয় উপনিষদেও এমন কথা শুনি:

> যে এ ভাবে ব্যাখ্যাত এই মহাসংহিতা জানে (বা এই মহাসংহিতাকে এই ভাবে ব্যাখ্যাত বলে জানে) সে যুক্ত হয় প্রজা (সন্তান) ও পশুর সঙ্গে, ব্রহ্মতেজ ও অন্নাহারের সঙ্গে এবং স্বর্গলোকের সঙ্গে (অর্থাৎ এগুলি লাভ করে)— য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাত বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন। (জৈ/উ ১:৩:৬)

এখন যজ্ঞক্রিয়ার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে তার সম্বন্ধে যে বেদাংশ তার যথাযথ ব্যাখ্যা। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞটাই ছিল মুখ্য, যথাযথ অনুষ্ঠিত হলে দেবতারা স্তবে ও নৈবেদ্যে প্রসন্ন হয়ে ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করতেন। এখন সে সবই গৌণ হয়ে গেল, মুখ্য হল যজ্ঞসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের বুদ্ধিগ্রাহ্য যথার্থ ব্যাখ্যা। যজ্ঞ যা ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করত, এখন তা করছে ব্যাখ্যা, বুদ্ধির কাছে পৌঁছে। এইখানে উপনিষদ জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ও অন্য বহু বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থানের মিল আছে: তারা সবাই যজ্ঞকর্মকে পরিহার করে বোধের ওপরে নির্ভরশীল। তাই এই মহাসংহিতার যারা ঠিকমতো ব্যাখ্যাটি জানে তারা সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, অন্নাহার, এমনকী স্বর্গলোকও পাবে। বেদে স্বর্গের কথা খুব কমই আছে। দুই একটি যাগের প্রসঙ্গে শুনি স্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক, অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যাগ করলে স্বর্গে যাওয়া যায়। কিন্তু সে-ও ত পরিষ্কার একটি যাগের মধ্যেমেই স্বর্গের নাগাল পাওয়া। আর এখন? এই মহাসংহিতার এই ভাবে ব্যাখ্যা যে জানে, সে পশু, প্রজা, অন্ন, তেজ, এবং স্বর্গ সবই পাবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ধর্মাচরণ এবং ধর্মতত্ত্বের ভরকেন্দ্রটি একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে গেছে। মোক্ষ কাম্য হওয়ার আগে তো মানুষের কাম্য ছিল এবং এইগুলিই, প্রজা, পশু থেকে স্বর্গ পর্যন্ত; এবং এগুলি-সংবলিত দীর্ঘজীবন, ইহলোক, এ জন্মেই। তাই সেই সব কাম্যবস্তুও জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায় এমন কথা বলে জ্ঞানমার্গের মাহাত্ম্য সূচিত হল। তার পর যেন বলছে এ সব ত পাওয়া যায়ই, এর চেয়েও কঠিন ও দুর্লভতর যা— জন্মান্তরের অনন্ত শৃঙ্খল থেকে অব্যাহতি— তা-ও পাওয়া যায়।

তত দিনে অভীষ্ট বা কাম্য পাল্টেছে। জ্ঞানমার্গকে প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় হল এ কথা বলা যে, এ মার্গ তাকে কর্মমার্গের প্রার্থিত বস্তু দান করতে সমর্থ এবং তার পরে এই মার্গের সুদূরতর, দুর্লবতর, দুরূহতর লক্ষ্য, মোক্ষ, দান করতে সমর্থ। এই ধরনের কথাই তৈত্তিরীয় উপনিষদেও শুনি:

যে কেউ এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত বলে জানে, সে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্নবান এবং অন্নভোজী হয়। প্রজায় এবং পশুতে এবং ব্রহ্মতেজে মহান হয়, কীর্তিতে মহান হয়— স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতঃ বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। (তৈ/উ ৩:৮)

এটি আগেরটিরই অনুরূপ, প্রভেদের মধ্যে এখানে নতুন একটি প্রতিশ্রুতি, কীর্তির। সব মিলে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চাইলে যা যা দরকার— সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্তি, তেজ, কীর্তি সবই পাওয়া যাবে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানলে। কোনও যজ্ঞক্রিয়া করে নয়, শুধু 'জেনে'। এটিই উপনিষদের যুগের বৈশিষ্ট্য।

ব্রহ্মের সঙ্গে অন্নকে অন্বিত করে বহু কথাই বলা হয়েছে:

তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম সংগ্রহ করা যায়, তার থেকে অন্ন জাত হয়। অন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য; লোকগুলি এবং কর্মে অমৃত— তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্। (মুণ্ডক উপ ১:১:৮)

তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল, মননজাত এই তপস্যা উপনিষদের কেন্দ্রস্থ উপায়, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানেই মোক্ষ লাভ করা যায় এবং তখনকার সমাজে ত মোক্ষই পরমার্থ। কিন্তু তার পরেই প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলা হচ্ছে: ব্রহ্ম থেকে অন্নলাভ হয়। অন্ন থেকে প্রাণ, মন, সত্য এবং কর্মে অমৃত লাভ করা যায়। এ অংশটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যে যুগ ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে মোক্ষ লাভ করতে উৎসুক তাকে এই শাস্ত্র কিন্তু প্রথমেই বলে, ব্রহ্ম থেকে অন্ন লাভ হয়। অর্থাৎ অন্নের প্রয়োজন ফুরোয়নি তখনও; যজ্ঞ দিয়ে না হলে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েই হোক, কিন্তু অন্নটা পাওয়া চাই। মনে পড়ে, একবার জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য এসে দাঁড়াতে জনক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে করে,' ঠাকুর— ব্রহ্মবিদ্যা না গোধন, কোনটা লাভ করবার জন্যে আসা?' যাজ্ঞবল্ক্য নিঃসংকোচে অম্লানবদনে বললেন, 'দুটোর জন্যেই, রাজা।' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাতে অন্নাভাব মেটে না। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে অন্নলাভ হয় এ কথা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিতরা রাজদ্বারে যে সম্মান পেতেন, রাজপ্রসাদে সেটা সহজেই সম্পত্তিতে ও অন্নে রূপান্তরিত হত। অন্ন থেকে প্রাণ লাভ বা রক্ষা হয় এ তো সহজেই বোঝা যায়। প্রাণ রক্ষা পেলে তবেই মন কাজ করে এবং তখন মানুষ যে কর্ম করে সেটা ব্রহ্মসন্ধান, ব্রহ্মোদ্যে অংশগ্রহণ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা— যাতে সিদ্ধি লাভ করলে অমৃত অর্থাৎ অমরত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ পুনর্জন্ম— উপনিষদে যাকে প্রথমে পুনর্মৃত্যু বলা হয়েছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। মৃত্যু থেকে পরিত্রাণই অমৃত। এই তত্ত্বের দিকে পরিপূর্ণ সংহতি আছে, কিন্তু এই কার্যকারণ পরম্পরার মধ্যে প্রথমটিই একটু বিস্ময়কর: ব্রহ্ম থেকে অন্নলাভ। এর দুটি তাৎপর্য: ব্রহ্মজ্ঞান ঐহিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, অন্নসংস্থান করে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এ যুগের যা সবচেয়ে কাম্য প্রাপ্তি— মোক্ষ, তার পথও ত ব্রহ্মজ্ঞানেই নিহিত আছে। তথাপি, তার পরেও নেহাতই স্থূল ঐহিক প্রয়োজন অন্নসংস্থান,

সেটিও উপেক্ষিত নয়, বরং ব্রহ্ম থেকে সর্বপ্রথম প্রাপ্তিই অন্ন। বাকিটা বারবার উচ্চারিত হয়েছে, অন্ন জীবন বা প্রাণ রক্ষা করে। শরীরেই মনের আধার, সেই মন সজীব থাকে, দেহ তার প্রয়োজনীয় অন্ন পেলে। সক্রিয় মনই সত্যসন্ধান করে এবং এই সন্ধানের শেষ প্রান্তেই আছে অমৃত।

অন্নলাভ, এই উপনিষদের যুগেও সহজ ছিল না। ঐতরেয় উপনিষদে পড়ি প্রজাপতির বিষয়ে বলছে, 'তিনি দেখলেন এই সব লোকগুলি ও লোকপালদের। "এদের জন্যে অন্ন সৃষ্টি করি"। তিনি জলরাশিকে তপস্যায় অভিতপ্ত করলেন। সেই জলরাশি তপ্ত হলে তাদের থেকে মূর্তি জাত হল, অন্নই হল সেই মূর্তি— স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি। সোঽপোঽভ্যতপৎ। তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ।' (ঐ/উ ১:৩:১) অন্যত্র অন্নকে সৃষ্টির পর স্রষ্টার খেয়াল হল, 'এরা খাবে কী?' তখন তিনি জলকে তপ্ত করলেন, সেই তপ্ত জলের অভ্যন্তরে মূর্তির জন্ম হল; সে মূর্তি অন্ন। বিজ্ঞানও বলে জলে তাপ সংযাগ হলে তার মধ্যে উদ্ভিদের জন্ম হয়। সেই উদ্ভিদই প্রাণীর প্রথম খাদ্য। এর মধ্যে লক্ষণীয় শব্দটি হল 'তাপ'। 'তপস্যা' এই শব্দেরই সজন্মা; প্রজাপতি কোথাও তপস্যা করে খাদ্য সৃষ্টি করছেন, কোথাও-বা জলকে তপ্ত করে তার থেকে প্রথম শৈবাল বা উদ্ভিদ সৃষ্টি করছেন যা প্রাণী আহার করতে পারে। অন্নের সংস্থান করা সৃষ্টিকর্তার দায়, তা না হলে তো তাঁর সৃষ্টি অকালে বিনষ্ট হবে, খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটবে তাঁর সৃষ্ট প্রাণীর। তাই জীবসৃষ্টির অনতিকাল পরেই তিনি জীবনের অবলম্বন, জীবাতু বা জীবনদায়ী অন্ন সৃষ্টি করেন যাতে তাঁর জীবসৃষ্টি ব্যর্থ না হয়।

এত মহিমা যে-অন্নের তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলে:

> অন্নের নিন্দা কোরো না। তা (জীবনধারণের উপায়) ব্রত। প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নভোজী... অন্নকে কখনও প্রত্যাখ্যান কোরো না, তা ব্রত। (অর্থাৎ জীবনধারণের উপায়)। অন্নকে বহুল করে তুলো। পৃথিবী অন্ন, আকাহ অন্নভোজী— অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। ...অন্নং ন প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। অন্নং বহু কুর্বীত। পৃথিবী বা অন্নম্। আকাশোঽন্নাদঃ। (তৈ/উ ৩:৭-৩:৯)

এখানে অন্নের প্রতি যথাবিধি সমাদর প্রদর্শন করার কথা আছে। অন্নের নিন্দা করার কথাই ওঠে না। বিশেষত, যখন সমাজে ব্যাপক অন্নাভাব, তখন মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই জানে প্রাণই অন্ন, কারণ অন্ন বিনা প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব, অনাহারের অর্থই মৃত্যু। এই সমাজে যেখানে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে না, সর্বদাই ক্ষুধা ও অন্নের পরিমাণের মধ্যে বেশ বড়, দুরতিক্রম্য একটি ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে, সেখানে বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হল ওই ব্যবধানটি ঘোচাবার চেষ্টা করা। এর উপায় হল প্রচুর পরিমাণে অন্ন উৎপাদন করা। অন্নকে বহুগুণিত করা। ক্ষুধার অন্ন যে চেহারাতেই আসুক না কেন, তাকে প্রত্যাখ্যান না করা। তখন মানুষ জপ করবে, 'আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন; আমি অন্নভোজী, আমি অন্নভোজী,

আমি অন্নভোজী— অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ।' (তৈ/উ ৩:১০:৬) এই শাস্ত্র যেখানে বিস্মিত করে তা হল, এটা জ্ঞানকাণ্ডের যুগ; এখন মানুষকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জগতের উর্ধ্বে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা উপলব্ধি করতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ নিরবিচ্ছিন্ন জন্মান্তরের আবর্তনকে ছেদন করে মানুষকে মুক্তি দেবে ওই বোধ। আর অন্ন তো ক্ষুধা প্রশমিত করে দেহকে সুস্থ, পুষ্ট ও দীর্ঘায়ু করবে, জন্মান্তরের ধারার অবসান করতে বিলম্ব ঘটাবে। যে আর জন্ম নিতে না চায়, সে কেন দেহকে পুষ্ট করতে, দীর্ঘ পরমায়ুর অধিকারী হতে চাইবে?

আপাত ভাবে কোনও বিরোধ না থাকলেও, ইহমুখীনতা ও মোক্ষমুখীনতার মধ্যে একটা বিরোধ তো আছেই। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে ইহলোকের সুখ সম্বন্ধে তাঁর অনীহা জানিয়েছেন। সুদীর্ঘ কঠোপনিষদের কাছে জেনে নেওয়া, কারণ 'কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে, আবার অনেকে বলে, কিছুই থাকে না।' সেই খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়েও অনেকে বলত, মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না! এই নিয়ে যখন এত ব্যাকুলতা, তখন অন্নের জন্যে এই দুশ্চিন্তা খানিকটা অবাক করে বৈকি। যাজ্ঞবল্ক্য তপস্যা করবার উদ্দেশে বনে যাওয়ার আগে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দিতে উদ্যত হলে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করেন, যা তিনি দিয়ে যাচ্ছেন তাতে অমরত্বের সম্ভাবনা আছে কিনা। মনে রাখতে হবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে সভাসমিতিতে বারেবারে নানা তত্ত্বকথা বলে যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজা ও অন্যদের কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। সেই বিপুল সম্পত্তির অর্ধেকের অর্থ অন্নাভাব থেকে চিরতরে অব্যাহতি এবং প্রাচুর্য। এই সহজ কথাটা কাত্যায়নী বুঝেছিলেন, তাই আর কোনও প্রশ্ন তোলেননি। মৈত্রেয়ী তুলেছিলেন। ক্ষুধা বা অশনায়া যখন মৃত্যু, তখন কোনও মতেই যাতে মৃত্যুর বশবর্তী না হতে হয় সে জন্যে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হল অমৃত, বা মোক্ষলাভ। সেই সাধনাতেই যাচ্ছেন যাজ্ঞবল্ক্য। স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্পত্তির অর্ধাংশে তাঁর অধিকার আছে, কাজেই যাজ্ঞবল্ক্য অমৃতের অধিকারী হলে মৈত্রেয়ীও তার অর্ধেকে অধিকারিণী।

এই অমৃতত্ব জন্মান্তর-পরম্পরা-ছেদেরই অপর নাম। উপনিষদের যুগে এইটিই পরম অভিলষিত বস্তু। অধিকাংশ উপনিষদের অধিকাংশ জুড়েই এ নিয়ে আলোচনা। কর্মকাণ্ড থেকে জ্ঞানকাণ্ডে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকে ভাল ভাবে বেঁচে থাকার উপকরণগুলির জন্যে সন্ধান গৌণ হয়ে গেল; অমৃতের সন্ধান, জন্মান্তর-নিরোধের সাধনাই হল মুখ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'অন্নকে নিন্দা কোরো না, অন্নকে প্রত্যাখ্যান কোরো না... অন্নকে প্রচুর করে তোলো... আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্নভোজী, আমি অন্নভোজী, আমি অন্নভোজী'— বারে বারে এ কথা বলা যেন মূল প্রসঙ্গকে লঙ্ঘন করে, উপেক্ষা করে গৌণ, অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিষয়ে মনোনিবেশ করা। কিন্তু সমস্ত উপনিষদ জুড়ে এত বেশি বার এত বিভিন্ন ভাষায় ও নানা প্রসঙ্গে অন্ন সম্বন্ধে মানুষের তীব্র উদ্বেগ, আশঙ্কা, প্রার্থনা ও অন্ন সম্বন্ধে এত সশ্রদ্ধ মনোভাব দেখা যায় যে বিস্ময় জাগতে বাধ্য।

খাদ্যের আখ্যান

অন্ন কেবলমাত্র জীবনধারণেরই উপকরণ ছিল না। অন্নবান ব্যক্তি সমাজে সমাদর পেত এমন ইঙ্গিতও আছে মাঝে মাঝে। একটির উল্লেখ করা যায়:

> জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করতেন, বহু দান করতেন, বহু পাক করতেন, সব দিক থেকে তিনি (এই উদ্দেশ্যে) চারদিকে পান্থশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন যেন সকলে তাঁর অন্নভোজন করুন— জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাকা আস। স হ সর্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্বত এব মেহন্নমস্যন্তীতি।' (ছান্দ্যোগ্যোপনিষদ ৪:৩:১)

নিঃসন্দেহে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণই একমাত্র ধনী ও অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন না। এই উপনিষদে যে প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছে সেটা হল, তিনি নিজের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্যে কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অনুনয় করতে চান। জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের পরিচয় সূত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর বহু অন্ন, তিনি বহু দান করেন এবং সশ্রদ্ধ ভাবে দান করেন। অন্যত্র দান সম্বন্ধে উপনিষদের উপদেশ মনে পড়ে, 'শ্রদ্ধাসহকারে দান করবে, অশ্রদ্ধায় দিও না।' তা এই জানশ্রুতি শ্রদ্ধাসহই দান করতেন। কী দান করতেন? বিপুল পরিমাণ খাদ্য। কারণ তাঁর নির্মিত বহু অতিথিশালাতে নিত্য বহু অন্ন পাক করা হত; তাঁর বাসনা ছিল, 'চারদিক থেকে লোক এসে আমার অতিথিশালায় আহার করুক।' এই ধরনের অন্নসত্র স্থাপনের পশ্চাতে যে সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিকা ছিল, স্বভাবতই তা অন্নাভাবের। যাদের নিজেদের বাড়িতে অন্নকষ্ট নেই, তারা রাজার বা ধনীর অতিথিশালায় রোজ খেতে যাবে কেন? কিছু নিশ্চয়ই পান্থ, দূরপথযাত্রী ছিল যাদের বাধ্য হয়েই পান্থশালার অন্ন ও আশ্রয় গ্রহণ করতে হত। কিন্তু অনেকগুলি অতিথিশালায় নিয়মিত বহু অন্ন পাকের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অন্নাভাবগ্রস্ত বহু মানুষের অন্নসংস্থানের জন্যেই। এখানে একটি কথা বেশ প্রাসঙ্গিক— শ্রদ্ধা সহকারে অন্নদান। কথাটা ওঠে এমন ক্ষেত্রেই শুধু যেখানে অশ্রদ্ধায় দান করাটা প্রাসঙ্গিক হতে পারত, অর্থাৎ অন্নহীন দরিদ্রদের অন্ন দেওয়ার ক্ষেত্রেই। সে দেওয়া প্রায়শই হতশ্রদ্ধায় দেওয়া হয়ে থাকে, যাকে আমরা বলি 'কাঙালিভোজন'। জানশ্রুতির ওই সব অতিথিশালায় প্রত্যহ যা অনুষ্ঠিত হত তা প্রকৃতপক্ষে কাঙালি-ভোজনই বটে। কিন্তু পাছে অভাবকে তাচ্ছিল্য করা হয়, তাই তিনি

শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতেন। তিনি মানে তাঁর নির্দেশে ওই পান্থশালার অন্নসত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। আরও একটা প্রচ্ছন্ন কারণ অবশ্যই ছিল, অন্তত জানশ্রুতির মনে: তা হল যেখানে দেশব্যাপী অন্নাভাব, যেখানে প্রচুর ক্ষুধা আর অপ্রচুর খাদ্য, সেখানে অন্নহীন মানুষ তো তার অন্নভাবের জন্যে দায়ী নয়, কাজেই তাদের অশ্রদ্ধা করা ঠিক হয় না।

কিন্তু যে ব্যাপারটা প্রথমেই আমাদের চোখে লাগে তা হল, দেশে ব্যাপক অন্নাভাব ছিল ঠিকই; দলে দলে মানুষ জানশ্রুতির অন্নসত্রে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত ঠিকই; কিন্তু দেশে যে অন্ন ছিল না তা তো নয়। জানশ্রুতির ওই অন্নসত্রগুলিতে যে বহু অন্ন পাক হত সেটা তো কোথাও না কোথাও মজুত ছিল— তা হলে দেখা যাচ্ছে, অন্ন ক্ষুধিতের কাছে পৌঁছত না, কারণ বিত্তবানরা তা কিনে নিয়ে জমিয়ে রাখত এবং ক্ষুধিতের অন্নদানসেবা করত। এতে জানশ্রুতিরা দু'ভাবে যশস্বী হতেন: এত অন্ন বাজার থেকে কিনে মজুত করবার মতো বিত্ত তাঁদের ছিল বলে, আর, এত ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণের মতো পুণ্যকাজ তাঁরা করতেন বলে। বলাই বাহুল্য, সব বিত্তবান অন্নসংগ্রহ করতে পারলেও বুভুক্ষুর জন্যে তা খরচ করতেন না, অন্ন নিয়ে দেশে ও বিদেশে বাণিজ্য করে বিত্তবানরা বিত্তবত্তর হতেন। এটা শুধু স্বাভাবিক নয়, চিরাচরিত ব্যাপার। বহু অন্ন অর্থ দিয়ে সংগ্রহ করতে পারলে সমাজ বিশেষত যে সমাজে এত অগণ্য ক্ষুধার্ত মানুষ— সে সমাজ ওই ধনী ব্যক্তিকে অন্য চোখে অর্থাৎ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। সে দিনও দেখত, আজও দেখে। অর্থাৎ বিত্তবান ব্যক্তি ক্ষুধিতের অন্ন অর্থ দিয়ে কিনে নিরন্ন সমাজে একটা কৃত্রিম সম্মান পেত। কৃত্রিম, কারণ— অন্ন সরাসরি ক্ষুধিতের অন্নপাত্রে না পৌঁছে ধনীর ভাণ্ডারে পৌঁছচ্ছে, এবং এই ধরনের ব্যবসায়ী যদিও নিরন্নকে আহার করিয়ে সে অন্নের সদ্ব্যবহার, অর্থাৎ যথার্থ পরিণতিই ঘটাত তবু ক্ষুধা আর অন্নের মধ্যে যে ব্যবধান সেইখানেই ওই ধনী মজুতকারীর ভূমিকা এবং তাকে অবলম্বন করেই তাদের পুণ্যার্জন। জানশ্রুতির বাসনা ছিল, 'সকলে আমার অন্ন ভোজন করুক।' বাসনাটিতে বদান্যতা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু একটু অহমিকাও কি ছিল না? 'সকলে আমার অন্ন ভোজন করুক'— এ ব্যবস্থা তো স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক হত সকলে নিজের গৃহের অন্নই যথেষ্ট পরিমাণে আহার করুক এই বাসনা। ঘটনাচক্রে সমাজের অর্থনীতি যখন সে ব্যবস্থা করে না, তখনই জানশ্রুতিরা দুঃখীর পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পুণ্যবান ও যশস্বী হন।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের কাহিনিতে ব্যাপক অন্নাভাবের পটভূমিকা আছে যার প্রতিকারকল্পে ওই অন্নসত্রগুলির প্রতিষ্ঠা। এ কাহিনির পরবর্তী অংশটিতে আমরা জানতে পারি:

> জানশ্রুতি রাজা ছিলেন। ঐশ্বর্য ও অন্নদানের জন্যে তিনি যশস্বী ছিলেন। এক রাত্রে একটি হংস অপর একটি হংসকে বলছে, 'জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের দীপ্তি দ্যুলোক পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে; দেখো, যেন তার তাপ তোমাকে দগ্ধ না করে।' অন্য হংসটি উত্তরে বলল, 'যে প্রশংসা কেবল সযুগ্বা রৈক্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সে প্রশংসবাক্য তুমি কার সম্বন্ধে প্রয়োগ করলে?' তাতে প্রথম হংসটি জিজ্ঞাসা করল, 'সেই সযুগ্বা রৈক্ক কেমন লোক?' তখন প্রথম হংসটি উত্তরে বলল, 'পাশা খেলায় সবচেয়ে উঁচু দান পড়লে

তার চেয়ে ছোট দানগুলো যেমন তার অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনই অন্য সব পুণ্যবানদের পুণ্য রৈক্কের পুণ্যেরই অন্তর্গত। রৈক্কের মতো জ্ঞান অন্য কোনও মানুষের দেখলে তাকে আমি রৈক্কের মতো জ্ঞানবান বলতাম।' দুটি হংসের এই আলাপ গাছের নীচে থেকে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শুনলেন।

লক্ষ করলে দেখি, রাজা জানশ্রুতি ধনী ছিলেন কিন্তু সযুগ্বা রৈক্ক অসাধারণ পুণ্যবান ছিলেন এবং বিদ্বানও ছিলেন। পরদিন ভোরে গাত্রোত্থান করার সময়ে রাজার বৈতালিকেরা যখন তাঁর বন্দনা করছিলেন তখন রাজা বললেন, 'ওহে সযুগ্বা রৈক্কের মতো কি বললে আমাকে?' সারথি রাজাকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজন্, সেই সযুগ্বা রৈক্ক কে?' তখন রাজা রৈক্ক সম্বন্ধে ওই হংসের দেওয়া সংজ্ঞাটি বললেন, তাঁর পুণ্য ও তাঁর বিদ্যা যে অতুলনীয় সে কথা জানালেন। সারথি রৈক্কের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না এবং রাজাকে সে কথা জানালেন। রাজা বললেন, 'যেখানে ব্রাহ্মণদের খোঁজ পাওয়া যায় সেখানে এঁর সন্ধান কর।'

তখন সারথি দেখলেন, একটা গরুর গাড়ির নীচে শুয়ে একজন লোক তার খোস চুলকোচ্ছে। সারথি সেখানে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করে প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, আপনিই কি সযুগ্বা রৈক্ক?' 'হ্যাঁ আমিই সে।' শুনে সারথি রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'খোঁজ পেয়েছি, মহারাজ।' তখন রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছ'শো গাভী, কণ্ঠহার ও অশ্বতরীসমেত রথ নিয়ে তাঁর কাছে এসে বললেন, 'মহাশয়, রৈক্ক, এই গাভী, রথ, অশ্বতরী ও কণ্ঠহার আপনারই জন্যে এনেছি। আপনি যে দেবতার আরাধনা করে থাকেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন।' উত্তরে রৈক্ক পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'হে শূদ্র, গাভীগুলো তোমার কাছেই থাকুক।' তখন আবার জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ এক হাজার গাভী, রথ, অশ্বতরী কণ্ঠহার, এবং নিজের কন্যাকে নিয়ে রৈক্কের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এই সবই আপনার জন্যে এনেছি, এটি আপনার পত্নী, এবং যে-গ্রামে আপনি বাস করেন সে গ্রামটিও আপনারই হোক। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে উপদেশ দিন।' রৈক্ক বুঝলেন, কন্যাটিকে উপঢৌকন দেওয়া হচ্ছে বিদ্যাগ্রহণের সূত্রপাতের কামনায়; বললেন, 'হে শূদ্র, তুমি এ সব এনেছ যাতে এগুলি অবলম্বন করে আমার মুখ খোলাতে পার।'

অতঃপর তিনি জানশ্রুতিকে দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করলেন। মহাবৃষদেশ রৈক্কপর্ণ বলে বিখ্যাত যে সকল গ্রামে রৈক্ক বাস করেছিলেন জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সে সমস্ত গ্রামই রৈক্ককে দান করেছিলেন। অর্থাৎ রাজার প্রতিজ্ঞা শোনবার পরে রৈক্ক বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করেছিলেন এবং সেই সমস্ত গ্রামই রাজা তাঁকে দান করেছিলেন।

জানশ্রুতির খোস চুলকানো তাৎপর্যপূর্ণ। খোস অপুষ্টি থেকে হয়, অতএব রৈক্ক অভাবগ্রস্ত ছিলেন। জানশ্রুতির উপঢৌকন থেকেও বোঝা যায় ধন দিয়ে অভাবগ্রস্ত পণ্ডিতকে নিজের অনুকূলে আনবার চেষ্টা চলছে, এবং রাজাকে 'শূদ্র' বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেও রৈক্ক শেষ

পর্যন্ত তাঁর দান গ্রহণ করে তাঁকে আধ্যাত্মবিদ্যার বিষয়ে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষারই মাঝামাঝি জায়গায় শুনি:

> কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর কাছে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চান। তাঁরা ভিক্ষা না দিয়ে তাঁকে দার্শনিক প্রশ্ন করেন, উত্তরে তিনি বলেন, 'অদ্বিতীয় দেবতা যে প্রজাপতি, যিনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করেন তিনি চারটি মহাত্মাকে গ্রাস করেন। মর্ত্য মানুষ তাঁকে দেখতে পায় না; তিনি বহুরূপে অবস্থিত। এ-অন্ন যাঁর জন্যে, তাঁকেই এটা দেওয়া হল না।' কাপেয় শৌনক কথাটা ভেবে ব্রহ্মচারীর কাছে এসে বললেন, 'হে ব্রহ্মচারি, স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছু যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়, যিনি সমস্ত দেবতার আত্মা, যাঁর দন্ত ভগ্ন নয় এমন ভক্ষক তিনি, এই-যে মেধাবী তাঁকে কেউ ভক্ষণ করে না, কিন্তু তিনি অন্য সব কিছুকে ভক্ষণ করেন বলে (পণ্ডিতরা) বলেন, তাঁর মহিমা অপরিমেয়। আমরা তেমন ব্রহ্মাকেই উপাসনা করি।' তার পর তিনি (অনুচরদের) বললেন, 'এঁকে অন্ন দাও।' তারা তাঁকে অন্ন দিল।... 'তাই সমস্ত দিকেই অন্ন দশ-ত্ব প্রাপ্ত হয় (দশগুণ হয়); সেই বিরাট-ই অন্নভোক্তা, সে-ই সব কিছু দেখেছে, অন্নভোজী-ও হয়েছে, এ কথা যে জানে, এ কথা যে জানে— তস্মাৎ সর্বাসু দিক্ষ্বন্নং দশ কৃতং সৈষা বিরাডন্নাদী ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।' (ছান্দোগ্য; ৪:৩:৮)

এই পুরো উপাখ্যানটিতেই কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো। পরের দিকের তত্ত্বকথার বক্তা অপুষ্টির রোগে ক্লিষ্ট, দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণ রৈক্ক। তা হলে জ্ঞানী ব্রাহ্মণও সেই যুগে— খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতকে— সব সময়ে অভাব থেকে নিষ্কৃতি পেত না। এ সময়ে নানা প্রস্থানের ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্মান পেলেও সব সময়ে অন্ন পেতেন না। সব পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের মতো সৌভাগ্যবান ছিলেন না, রাজা জনকের মতো মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক সব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভাগ্যে জুটত না। ফলে জ্ঞানবুদ্ধি নিয়েও বহু পণ্ডিত অভাবে পীড়িত হতেন। কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর প্রসঙ্গে বায়ু, প্রাণ, ইত্যাদি বিষয়ে দু-চারটি তত্ত্বকথার পরেই রৈক্ক হঠাৎ বলেন যে, এঁদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা পেলেন না। প্রশ্ন করে ব্রহ্মচারীর জ্ঞান কতটা তা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন। উত্তর দিয়ে ব্রহ্মচারী বলেন, 'এ-অন্ন যাঁর জন্যে, তিনিই তা পেলেন না।' অর্থাৎ ওঁদের অন্ন বুভুক্ষু ব্রহ্মচারীর জন্যেই হওয়া উচিত ছিল, সে-ই তা পেল না, কথাটা শুনে কাপেয় শৌনকের খটকা লাগে। তিনি পরমাত্মার বর্ণনা দিতে অন্যান্য নানা বিশেষণের সঙ্গে বললেন, 'যাঁর দাঁত ভাঙা নয় এমন ভক্ষক তিনি, তাঁকে কেউ ভক্ষণ করেন না, তিনি অন্য সব কিছুকে ভক্ষণ করেন; তাঁর মহিমা অপরিমেয়।'

পরমাত্মার বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি অভগ্নদন্ত, অর্থাৎ যাঁর দাঁত ভাঙা নয়। স্বভাবতই মনে পড়ে বৈদিক দেবতা পূষার কথা। গোপথব্রাহ্মণ বলে, প্রজাপতি রুদ্রকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করেন; রুদ্র যজ্ঞকে বিদ্ধ করলে তা 'প্রাশিত্র' হয়ে যায়, প্রাশিত্র হল যজ্ঞের হবি-র

যে অংশ অথর্ববেদের পুরোহিত ব্রহ্মা ভোজন করে। সেই প্রাশিত্রের দিকে তাকিয়ে ভগ অন্ধ হয়ে যান, সবিতার হাত দুটি খসে পড়ে এবং পূষা সেই প্রাশিত্র খেতে উদ্যত হলে তাঁর সব দাঁত ভেঙে যায়। (গোপথব্রাহ্মণ উত্তরভাগ; ১:২) দেবতাদের মধ্যে তা হলে একজন ভগ্নদন্ত ছিলেন পূষা, এবং দেবতা হিসেবে যজ্ঞের হব্য ভোজনে তাঁর অধিকারও ছিল, কিন্তু সেই হব্য ভোজন করতে গিয়ে তাঁর আহারের উপাদান অর্থাৎ দাঁত সব ভেঙে যায়। তা হলে অভগ্নদন্ত হলেন এমন দেবতা, প্রাশ্রিত্রভোজনে যাঁর অধিকার এমন পর্যায়ে স্বীকৃত যাতে তিনি অভগ্নদন্ত থাকতে পারেন। অর্থাৎ সর্ববিধ ভোজনে যাঁর অবিসংবাদিত অধিকার। ভোজনে অধিকার, সমাজে স্বীকৃতি এবং গৌরবের একটি মানদণ্ড।

এই উপাখ্যানে আমরা কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীকে দেখি ভোজনে অধিকারী অন্নবান কৃতী পুরুষ দুজন। এ কথা এমনই সর্বজনবিদিত ছিল যে ক্ষুধার্ত ব্রহ্মচারী তাঁদের কাছেই খাদ্যপ্রার্থনা করে। সমাজে খাদ্যে মানুষের সমান অধিকার ছিল না, ওই ধনী অন্নবানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অন্ন ছিল। এক দিকে প্রয়োজনের অতীত বাড়তি খাদ্য, অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত বুভুক্ষার ক্ষুধা; কিন্তু এ দুয়ের সংযোগ সর্বদা ঘটত না। ঋগ্বেদের সেই 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ... কেবলাদী ভবতি কেবলাঘঃ', অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি ব্যর্থ অন্ন ভোজন করে; যে একা খায় তার পাপ তার একারই হয়— এ সব কথা সমাজমানসে প্রোথিত ছিল অন্তত তিন-চারশো বছর ধরে; তবু এ উপাখ্যানে দেখি খাদ্যদানে কার্পণ্য। এর পেছনে অন্নবানের সেই ত্রাস: কী জানি, কখন ক্ষুধার দিনে হয়তো খাদ্য জুটবে না। এরা তাই 'তরাসে নিষ্ঠুর'। অর্থাৎ পর্যাপ্ত অন্ন সংগ্রহ করেও মানুষ বরাবরই ক্ষুধার সময়ে খাদ্য জুটবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কায় ভুগত। এবং নিশ্চয়ই এ আশঙ্কার কারণও ছিল।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য যার ভাণ্ডারে, সমাজে তার সম্মানের স্থান ছিল এটাও এ উপাখ্যানে লক্ষ্য করি। তার উদ্বৃত্ত অন্ন আছে, ভৃত্য আছে, অতএব সমাজে প্রতিষ্ঠাও আছে। যে-বস্তু সমাজে দুর্লভ, সাধারণ মানুষ যা পর্যাপ্ত পরিমাণে সর্বদা পায় না এবং পাবার কামনায় একান্ত উৎসুক থাকে অথচ জানে যে সে রকম পাওয়া জনসাধারণের কাছে স্বপ্নমাত্র, সে-বস্তু, অন্ন। যার প্রচুর পরিমাণে আছে, ইচ্ছেমতো খেতে, দান করতে, বেচতে, জমিয়ে রাখতে পারে সে মানুষ তো সাধারণ লোকের ঈর্ষামিশ্রিত সম্ভ্রমের উদ্রেক করবেই; তখনকার অনিশ্চিত অন্নের যুগে যার অন্নভাণ্ডার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত সে তো সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেই। অন্ন তাই এক গভীর অর্থে ঐশ্বর্য ও সম্মানের মানদণ্ড ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে পড়ি উপমন্যুর পুত্র প্রাচীন শাল, পুলুষের পুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবির পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষের পুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িল একত্র হয়ে আলোচনা করছিলেন, 'কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম'। সমাধান না পেয়ে তাঁরা সকলে অরুণের ছেলে উদ্দালকের শরণাপন্ন হলেন। উদ্দালক নিজে উত্তর না দিয়ে কেকয়ের রাজা অশ্বপতির কাছে তাঁদের পাঠালেন। রাজা তখন যজ্ঞ করছিলেন। তিনি এঁদেরকে বললেন যজ্ঞে প্রত্যেক ঋত্বিককে যত দক্ষিণা দেওয়া হবে এঁদের প্রত্যেককে ততটাই দেওয়া হবে।

এঁরা বললেন, আমরা এসেছি আপনার কাছে বৈশ্বানর আত্মার স্বরূপ জানতে। রাজা পরদিন তাঁদের উত্তর দেবেন জেনে তাঁরা শিষ্যের মতো সমিৎ (জ্বালানি কাঠ) হাতে নিয়ে রাজার কাছে এলেন। রাজা একে একে তাঁদের প্রশ্ন করে জেনে নিলেন যে তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও রূপে বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তাই নানা ভাবে তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং তাঁদের বংশে ব্রহ্মতেজ জাত হয়। তাঁরা অন্নভোজী হয়েছেন এবং প্রিয় বস্তু দেখেন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই খণ্ডিত বা আংশিক ভাবে বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন, এবং তাঁরা যদি রাজার কাছে না আসতেন তা হলে তাঁদের সাংঘাতিক দৈহিক ক্ষতি, এমনকী প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটত। অবশেষে তিনি তাদের বলেন, তোমরা আংশিক ভাবে বৈশ্বানর আত্মাকে জেনে অন্ন আহার করছ, কিন্তু কেউ যদি প্রাদেশমাত্র (এক বিঘৎ পরিমাণ) বা অভিবিমান (আকাশের মতো অপরিমেয়) রূপে বৈশ্বানর আত্মাকে জেনে যথাযথ ভাবে উপাসনা করেন, তবে তিনি সকল লোকে, সকলের মধ্যে ও সরল আত্মাতে অর্থাৎ (আত্মার আধার শরীরে) অন্ন আহার করেন। রাজা প্রত্যেককে বলেন, 'অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে।' শেষে বলেন, 'এতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভুতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি। (ছা/উ; ৫:১২:২; ১৩:২; ১৪:২; ১৫:২; ১৬:২; ১৭:২; ১৮:১)

এ উপাখ্যানের উপসংহারটি প্রণিধানযোগ্য: বৈশ্বানর আত্মাকে যে তার স্বরূপে জানে সে সকল লোকে অর্থাৎ ভূলোক, দ্যুলোক, ইত্যাদি সকল স্থানেই সকল প্রাণীর মধ্যে সকল আত্মাতেই অন্ন আহার করে। সকল প্রাণীর মধ্যে, কারণ, তখন জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের সূচনার যুগ, তাই মানুষ মৃত্যুর পরে নানা অন্য প্রাণীর দেহে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে। সকল আত্মাতেই মানে— এ কথায় যে কোনও প্রাণীর দেহের আধারে যে আত্মা থাকে বলে তখন লোকে বিশ্বাস করত সেই সব আত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই দেহীর রূপে সে অন্ন আহার করে। কে করে? যে বৈশ্বানর আত্মাকে তার স্বরূপে জানে। এই আত্মাকে তার স্বরূপে জানাটাই উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কাজেই এ-ই হল এ যুগের মুখ্য জ্ঞেয় বা জানবার ও উপলব্ধি করার বস্তু, যার দ্বারা মানুষ পুনর্জন্ম থেকে মোক্ষ লাভ করে অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডে প্রতিশ্রুত শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করে। এ কাহিনির উপসংহারে শুনি, এই শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান যে লাভ করেছে সে সকল লোকে, সকল প্রকার প্রাণীর দেহে অধিষ্ঠিত হয়ে অন্ন আহার করে। অর্থাৎ মোক্ষের যেন একটা বিকল্প রূপ হল সকল অবস্থায়— জন্মে জন্মে, যে কোনও দেহের মধ্যে থেকেই অন্নভোগী হওয়া। নিরন্তর অন্নের অধিকারী হওয়া এমন একটা বিরল সৌভাগ্য, যা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই লাভ করে যে বৈশ্বানর ব্রহ্মকে খণ্ডিত ভাবে নয়, পূর্ণরূপে জেনেছে। এ শাস্ত্র বলছে না যে, সে মোক্ষলাভ করে, বরং বলছে সে নিঃসংশয়ে নিরন্তর অন্নভোজী হয়। অন্যত্র যেমন উচ্চারিত হয়েছে যে অন্নই ব্রহ্ম, সেই কথাটাই এখানে অন্য ভাবে উচ্চারিত হল।

'অন্ন শরীরে পরিপাক হওয়ার পর তিন ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল অংশ বিষ্ঠায় ও মধ্যম অংশ মাংসে পরিণত হয় এবং সূক্ষ্ম অংশ মনে পরিণত হয়— অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমতন্মাংসং যোঽনিষ্ঠস্তন্মনঃ।' (ছা/উ; ৬:৫:১) 'হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়— অন্নময়ং সৌম্য মন, আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি।' (ছা/উ; ৬:৫:৪) এই সংলাপ আরুণির সঙ্গে তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুর আলাপের একটি অংশ। এখানে শরীরের বর্জ্য পদার্থ, কলেবর— যা মাংসে গঠিত— এবং মন এই তিন ভাগে দেহীকে ভাগ করা হয়েছে এবং এ তিনটির মধ্যে দেহ ও মন অন্নের দ্বারাই গঠিত এ কথা বলা হয়েছে। পরের অংশে প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময় বলা হয়েছে, কিন্তু মনকে অন্নময়ই বলা হয়েছে। দেহীর ব্যক্তিত্বের যে দুটি শ্রেষ্ঠ সত্তা, মন ও আত্মা তাদের সঙ্গে অন্নকে কার্যকরণ রূপে ও অভিন্নরূপে যুক্ত করা হয়েছে। উদ্দালক বলেন, অন্নকে বৈশ্বানর আত্মা বলে জানা-ই সত্য জানা; আর এখানে বলা হল, মন সৃষ্টি করে অন্ন, এতে অন্নের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বিশেষ করে যখন মনে রাখি যে, উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত এবং জ্ঞানকাণ্ডে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বোধ ও বুদ্ধিকে, তখন সেখানে এই বোধ ও বুদ্ধির আধার, মনের তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। অন্নকে সেই মনের উৎপাদক বলে তার গরিমা বাড়ানো হয়েছে, যেখানে উপনিষদে এর বিপরীতটাই প্রত্যাশিত ছিল। অথচ বারেবারেই দেখছি উপনিষদে অন্নের মাহাত্ম্য নানা ভাবেই ঘোষিত হয়েছে:

> আরুণির পুত্র ছিল শ্বেতকেতু, তাঁকে পিতা বললেন, 'তুমি (গুরুগৃহে) বাস করে ব্রহ্মচর্য পালন কর, সোম্য, আমাদের বংশে বেদাভ্যাস না করে ব্রহ্মবন্ধু (যে ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণোচিত আচার) হয় না। সে বারো বছর বয়সে (গুরুগৃহে) গিয়ে চব্বিশ বছর বয়সে সমস্ত বেদপাঠ শেষ করে গম্ভীর, বেদজ্ঞানে অহংকারী ও অবিনয়ী হয়ে ফিরে এল। পিতা তাঁকে বললেন, 'সোম্য, তুমি ত গম্ভীর, বেদাভিমানী ও অবিনয়ী হয়েছ।'[১]
>
> তার সঙ্গে কিছু শাস্ত্রালাপের পরে আরুণি এক দিন তাকে বললেন, 'সোম্য, পুরুষের মধ্যে ষোলোটি কলা (অংশ) আছে, তুমি পনেরো দিন কিছু খেয়ো না, কিন্তু যত ইচ্ছা জল পান কোরো, প্রাণ জলময় (অর্থাৎ জলনির্ভর), (তাই) যে জল পান করে তার প্রাণ যায় না।' শ্বেতকেতু পনেরো দিন আহার করল না, পরে ষোলো দিনের দিন সে পিতার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা আমি কী বলব?' আরুণি তাকে বললেন, 'ঋক্, যজু ও সামগুলি উচ্চারণ কর।' শ্বেতকেতু বললেন, 'বাবা, ও-গুলি ত আমার

১. ওঁ শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ, 'শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং, ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি। স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হো পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী। স্তব্ধোঽসি...।' (ছা/উ; ৬:১:১-২)

মনে পড়ছে না।' তখন আরুণি তাকে বললেন, 'বড় একটা জ্বলন্ত আগুনের যদি সামান্য একটি অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা হলে তা দিয়ে তার চেয়ে বড় কিছু জ্বালানো যায় না। তোমার ষোলো কলার মধ্যে এখন মাত্র একটি কলাই অবশিষ্ট আছে, তার দ্বারা তুমি বেদগুলি আর অনুভব করতে পারছ না। তুমি গিয়ে আহার কর, পরে আমার সব কথা বুঝতে পারবে।' শ্বেতকেতু আহার করে আবার বাবার কাছে গেলেন। (তখন) পিতা তাঁকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন সে তার সব কিছুরই ঠিক উত্তর দিতে পারল। তখন পিতা তাকে বললেন, 'সেই প্রজ্বলিত বৃহৎ অগ্নির জোনাকির মতো মাত্র একটি কণা অবশিষ্ট ছিল। তাকে যদি খড়কুটো দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা যায় তা হলে (তখন) তার দ্বারা তার চেয়েও বড় বস্তুও পোড়ানো যায়। হে সোম্য, তোমার (অনাহারে) ষোলো কলার মধ্যে একটি মাত্র কলা বাকি ছিল। অন্ন-সংযোগে সেই (ক্ষীণ) কলাটি এখন জ্বলে উঠেছে, তার দ্বারা (তুমি) এখন বেদগুলি উপলব্ধি করছ। অতএব, সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক তেজোময়।' পিতার কথায় শ্বেতকেতু এটা বুঝতে পারলেন।[২]

উপবাসের পনেরো দিনে শ্বেতকেতু শুধু জলপান করেছিলেন তাই প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল, এই জন্যে প্রাণ জলনির্ভর। বেদ উচ্চারণ করবার জন্যে প্রয়োজন বাক্, বাক্ তেজনির্ভর, এই তেজ উপবাসে নির্বাপিত-প্রায় হয়েছিল, উপযুক্ত ইন্ধনে পুনরায় তেজ উদ্দীপিত হলে বেদবাক্য উচ্চারণ করা সম্ভব হল। কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করবে তো মন, সেই মন উপবাসে স্তিমিত, নিস্তেজ ও অন্তর্হিতপ্রায় হয়েছিল। সে মন পুনর্জীবিত না হলে বাক্য, বেদবাক্য, আবৃত্তি করবে কে? আর মন কিসে উজ্জীবিত হয়? অন্নে। উপবাসে যে জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হয়েছিল, অন্ন তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল মনকে সঞ্জীবিত করে।

এখানে দুটি ব্যাপার প্রণিধান করে দেখা প্রয়োজন। প্রথমেই আরুণি শ্বেতকেতুকে বলছেন, আমাদের বংশে সকলেই বেদচর্চা করে, অবেদজ্ঞ কেউ নেই, অতএব তুমিও যাও গুরুগৃহে বেদপাঠ কর। বারো বছরের শ্বেতকেতু গুরুগৃহে বারো বছর ধরে সমস্ত বেদ পাঠ করল,

২. 'ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ, পঞ্চদশাহানি মাহশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো ছেৎস্যত ইতি। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপাসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য ত ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টা স্যাৎ তয়ৈতর্হি বেদান্ নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি। স হা শাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে। তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তে তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ তেন ততোঽপি বহু দহেৎ। এবং সোম্য ত ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টাঽভূত সা অন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীৎ তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন অপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।' (ছা/উ; ৬:৭:১-৬)

আয়ত্ত করল। ফিরল বেদজ্ঞানের দম্ভ নিয়ে। পিতা জানেন, এ দম্ভ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মানায় না। অতএব এ দম্ভ দূর করতে হবে। শ্বেতকেতুর দম্ভের ভিত্তি তার বেদজ্ঞান, সে জানে বেদ সে আয়ত্তে করেছে; আরুণি তাকে বোঝাতে চাইলেন যে বেদ আয়ত্ত করলেও তা আয়ত্তে থাকে না। হাতছাড়া হয়ে যায়, অর্থাৎ মন থেকে হারিয়ে যায় যদি মনের যা প্রধান উপাদান, যার ওপরে মনের ভিত্তি তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। তাই শ্বেতকেতুকে উপবাস করিয়ে দেখালেন, সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে যা সে আয়ত্ত করেছে বলে তার এই দম্ভ, সেটাও সম্পূর্ণতই অন্ন নির্ভর। বারো বছরের সাধনার ধন মাত্র পনেরো দিনের অনাহারে মন থেকে সম্পূর্ণ উবে গেল। এবং যথাযথ আহার করার পরে আবার তা মনে সম্যক্ ভাবে প্রতিভাত হল। অতএব জ্ঞান মন-নিষ্ঠ এবং মন অন্ননির্ভর; অন্নাভাবে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, প্রয়োজনীয় আহারের দ্বারাই মন তাকে ধারণ করতে পারে। যে বেদজ্ঞান প্রবল ভাবে প্রজ্বলিত অগ্নির রূপে তার মনে ষোলো কলায় বিরাজ করছিল, পনেরোটা দিনের উপবাসে তার ক্ষীণ একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ আর কদিন উপবাসে দেহই ধ্বংস হত, এবং যেহেতু দেহাভ্যন্তরের মনই জ্ঞানের আধার, তাই দেহনাশে জ্ঞানও নিরবলম্ব হয়ে বিলুপ্ত হত। সেই একটিমাত্র ক্ষীণ কলাকে নেহাৎ স্থূল পুষ্টি, অন্ন দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার পর বারো বছরের অধীত বিদ্যা আবার মনে উদিত হল।

উপনিষদ বৈদিক যুগের শেষ ভাগের জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত; শুধু তাই নয়, বেদের অন্তর্ভাগ বলে 'বেদান্ত' এবং পরবর্তী কালে বেদের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের প্রতীক বলে স্বীকৃত। এ যুগে আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদের উপলব্ধিই সাধনার বস্তু; অধ্যাত্মচর্চার যুগ এটা। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমের প্রস্তাবিত সমস্ত ঐহিক সুখকে প্রত্যাখ্যান করেছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দু'বার একটি উপাখ্যান বিধৃত হয়েছে, সেখানে মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের দেওয়া বিপুল সম্পত্তির অর্ধাংশ লাভের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের আশায়। এই সেই যুগ যখন এক দিকে মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, আরও বহুতর সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায় যজ্ঞকে, বেদকে অস্বীকার করে জ্ঞানকে অবলম্বন করে মোক্ষের বা পুনর্জন্মের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সাধনা করছেন। সেই যুগে ব্রাহ্মণ্যধারার শাস্ত্র উপনিষদ, জ্ঞানের আধার মনকে স্থূল বস্তুনিষ্ঠ, অন্ননির্ভর বলে প্রতিপন্ন করছে। উপনিষদের আত্মজ্ঞান তত্ত্বনির্ভর, কিন্তু সে জ্ঞান উদিত হয় যে-মনে, সে-মন যে কোনও জ্ঞানকেই ধারণ করে থাকুক তা দেহে আবৃত এবং দেহ অন্নের দ্বারা পুষ্ট হলে তবেই জ্ঞান তার মধ্যে প্রজ্বলিত থাকতে পারে। আগেই বলেছি, অন্নের এই মাহাত্ম্য উপনিষদে ঘোষিত হওয়া খানিকটা বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আরুণি শ্বেতকেতুর সংলাপে অন্যত্র এক জায়গায় একবার আরুণি জলকে অশনায়া বলে তার পরেই বলছেন 'অন্ন ছাড়া আর কী মূল হতে পারে, তাই সোম্য, এই প্রকারে অন্নের মূল দিয়ে জলের মূল খোঁজ কোরো— তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ।' (ছা/উ; ৬:৮:৪)

আমাদের মনে পড়ে আরুণি যখন শ্বেতকেতুকে পনেরো দিন উপবাস করতে বলেন তখন বলেছিলেন, 'যত ইচ্ছা জল পান কোরো, তাতে জীবনরক্ষা হবে।' আরুণি এখানে কতকটা ব্যুৎপত্তিগত কষ্টকল্পনাতে এর পূর্ব অংশে অশনায়া মানে জল নিষ্পন্ন করলেন, কিন্তু ঠিক তার পরে পরেই বললেন অন্নের মূল দিয়ে জলের মূলের খোঁজ কর। অর্থাৎ কেবলমাত্র জলপানের দ্বারাও অনির্দিষ্টকাল প্রাণরক্ষা হয় না, অন্ন সম্পূর্ণ অপরিহার্য, তাই অন্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে জলের খোঁজ কোরো। এখানেও অন্নের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'অশনায়াপিপাসে' ক্ষুধাতৃষ্ণাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করা হয়েছে বারবার। তাই ব্যুৎপত্তি দিয়ে অশনায়াকে জলের সঙ্গে যুক্ত করলেও পিপাসার স্বতন্ত্র স্থান পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, যেমন অশনায়া বা ক্ষুধারও স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে।

এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই 'অন্নব্রহ্ম' পরিচ্ছেদে নারদ-সনৎকুমার সংলাপে এক জায়গায় পড়ি:

> বল থেকে অন্ন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে কেউ যদি দশ দিন না খেয়ে থাকে তা হলে যদিও বা সে (কোনও রকমে) বেঁচে থাকে তবু সে দৃষ্টিহীন, শ্রুতিহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন ও বিজ্ঞানহীন (বিশেষ-জ্ঞান-রহিত) হয়। আবার (যখন) অন্ন আহার করে (তখন) তার দৃষ্টি, শ্রুতি, মনন, বুদ্ধি ও ক্রিয়া আসে এবং বিজ্ঞানও আসে। অন্নকে উপাসনা কর। যে কেউ অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, তিনি এমন সব 'লোক' (স্থান) লাভ করেন যেখানে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ও পানীয় আছে। অন্নের যতদূর গতি তাঁরও ততদূর স্বচ্ছন্দ গতি হয়।[৩]

এখানে প্রথমে বলা হয়েছে, অন্নের অভাবে দশ দিনের উপবাসে মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় কী ভাবে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বোধ, ক্রিয়া ও বিশেষ জ্ঞানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ যে সব বিশেষ শক্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে 'মানুষ' সংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ার অধিকার দেয়, যে-অধিকারবলে সে ব্রহ্মজ্ঞানচর্চার ক্ষমতা পায় এবং জন্মান্তরধারা রোধ করার ব্যবস্থা করতে পারে সেই সব ক্ষমতাই দশ দিন অনাহারে তিরোহিত হয়। আবার ভাল করে আহার করার পরে ধীরে ধীরে সে সব ক্ষমতা ফিরে আসে। অতএব 'অন্নকে উপাসনা কর।' যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন তাঁর এমন সব স্থানে অধিকার জন্মায় যেখানে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ও পানীয় আছে; অন্নের সীমা বা গতি যত দূর পর্যন্ত তাঁরও গতি তত দূর পর্যন্ত। অর্থাৎ তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর

৩. অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঽ দ্রষ্টাঽ শ্রোতাঽ মন্তাঽ বোদ্ধাঽ কর্তাঽ বিজ্ঞাতা ভবত্যথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি। স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽ ভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেৎস্তি। (ছা/উ; ৭:৯:১-২)

কখনওই অন্নজলের অভাব হবে না। কার এই সৌভাগ্য? যিনি অন্নকে ব্রহ্ম বলে জানেন এবং সে ভাবে উপাসনা করেন। স্মরণীয়, এই পরিচ্ছেদটির নামই হল 'অন্নব্রহ্ম'। এ অংশের দুটি ভাগ: প্রথমটিতে দেখানো হয়েছে শ্বেতকেতুকে আরুণি যা বুঝিয়েছিলেন অর্থাৎ অন্নাভাবে ইন্দ্রিয়গুলি— বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দুইই— সম্পূর্ণ অসহযোগ করে; তারা যেন থেকেও নেই। অথচ ধর্মসাধনার এই পর্যায়ে যে ব্রহ্মজ্ঞান পুনর্জন্ম খণ্ডন করার জন্যে অপরিহার্য, তার আধার হল মন, এবং মন আশ্রিত থাকে ওই ইন্দ্রিয়গুলির ওপরে। এবং এই অংশে দেখানো হল ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল খাদ্যের ওপরে। তা হলে প্রকারান্তরে উপনিষদের কেন্দ্রবস্তু যে ব্রহ্মজ্ঞান তা-ও একান্তরিত হয়ে নির্ভরশীল হয়ে উঠল অন্নের ওপরে, যেহেতু অন্ন বিনা সকল ইন্দ্রিয়ই নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, মনও বিকল হয়ে যায় এবং সে-অবস্থায় শ্বেতকেতু পনেরো দিন অনাহারের পরে বারো বছরে শেখা বেদজ্ঞান মনেই আনতে পারে না, নতুন করে ব্রহ্ম ও আত্মার একাত্মতা উপলব্ধি করা তো দূরের কথা। আবার অন্ন গ্রহণের পরে ইন্দ্রিয়গুলির সকল ক্ষমতাই ফিরে আসে। এখানে অন্নের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের সংযোগ প্রায়োগিক ভাবে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই উপলব্ধির যে সিদ্ধান্ত সেইটিই উপস্থাপিত করা হয়েছে: এই-ই যখন সম্বন্ধ অন্নের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের, তখন তো অন্নই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তির এই দৃষ্টি এসেছে, যে জেনেছে যে অন্ন বিনা অধ্যাত্মচর্চা করা শুধু দুষ্কর নয়, একান্তই অসম্ভব, সে অন্নকে ব্রহ্ম জেনে উপাসনা করে। যজ্ঞেও ছিল কর্মকাণ্ডের উপাসনা; তার ফল ছিল ঐহিক সুখের জন্যে কাম্যবস্তু লাভ করা। এবারে অন্নকে ব্রহ্ম জেনে যে উপাসনা, তা যজ্ঞের মতো অনুষ্ঠাননির্ভর কোনও যাগ নয়, তা হল একটা উপলব্ধি: অন্নই ব্রহ্ম। এ উপলব্ধির একটা বহিঃপ্রকাশ আছে; তা হল অন্ন সম্বন্ধে চূড়ান্ত সম্ভ্রমবোধ। সকল দেবতার ওপরে যেমন ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, তেমনই পার্থিব বস্তুর সব কিছুরই ওপরে অন্নের স্থান। এ কথা মনে থাকলে মানুষ অন্ন উৎপাদনে তৎপর হবে, সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে, অপচয়ের সম্ভাবনা রোধ করবে, দানও করবে নিজের প্রয়োজনের উপযোগী অন্ন সুরক্ষা করার পরে। সংক্ষেপে, সংসারে শ্রেষ্ঠ দেবতার যে সম্মান প্রাপ্য অন্নের প্রতিও যেন মানুষের সেই সম্মান থাকে।

এই ধরনের সতর্কবাণী অন্যত্রও উচ্চারিত হয়েছে। কেন? স্পষ্টতই অন্নের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে অবহিত ছিল না। যে বছর ভাল ফসল হত, সে বছর ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়া হত, ফলে খরা-অজন্মার বছরে টান পড়ত। তা ছাড়া, উদ্বৃত্ত অন্ন বণিকের পণ্য হয়ে উঠত, দেশের অভুক্ত মানুষ নিরন্নই থেকে যেত। পরিশ্রমে উৎপাদন করা অন্নকে জীবনদায়ী বলে লোকে এমনিই জানত, কিন্তু স্পষ্টতই যে সম্ভ্রম থাকলে প্রতি কণা শস্য সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত মমত্ববোধ থাকে তা ছিল না। তাই অন্নের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব প্রতিপাদন করবার জন্যে অন্নকে, তখনকার শব্দকোষে যেটি শ্রেষ্ঠ অভিধা— ব্রহ্ম— তাই দিয়ে অভিহিত করা হল। মানুষ যেন মনে রাখে, যে-দেহে মনের অধিষ্ঠান, ইন্দ্রিয়গুলি যাতে সংস্থিত, যে-দেহ তার জীবিকার উপাদান জোগায়, যে-মন তার অভীষ্ট ব্রহ্মতত্ত্বকে

অনুধাবন করতে সচেষ্ট সে-দেহমন একান্ত ভাবেই অন্ননির্ভর। এই অন্নকে ব্রহ্ম নাম দিলে অন্ন সম্বন্ধে সমাজে একান্ত প্রয়োজনীয় মানসিকতা— সমীহ, সম্ভ্রম, যত্ন, তার বৃদ্ধিপ্রয়াস— এগুলি আসবে, নতুবা অন্ন তার যথার্থ মর্যাদা না পেলে অন্নের প্রতি অবজ্ঞা, অযত্ন উপেক্ষা অন্নের অভাবকেই বাড়িয়েই তুলবে। অর্থাৎ এখনও সমাজে অন্নের জোগান সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নেই। আরও লক্ষ করি, এখানে মহিমার একটা সংজ্ঞা হল, 'যে সব কিছু খায়'। অর্থাৎ বহুভোজিত্ব বা সর্বভোজিত্ব মহিমার একটা মানদণ্ড। তখনকার সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার ও সম্মানের একটা ভিত্তি যে ছিল অন্নের প্রাচুর্য, এ আমরা আগেও দেখেছি। এই সংজ্ঞা উচ্চারণ করার পর কাপেয় শৌনক ভৃত্যদের নির্দেশ দিলেন ব্রহ্মচারীকে অন্ন দিতে। ছোট উপাখ্যানটির শুরুতেই এ ব্রহ্মচারী ভিক্ষা চেয়ে না পেয়ে বলেছিলেন, 'এ অন্ন যার জন্যে, তাকেই এটা দেওয়া হল না।' স্পষ্টতই সে বলতে চায়, বুভুক্ষু যদি অন্ন না পায় তা হলে অন্নবানের অন্নসম্পদ ব্যর্থ। আবার দেখি, মনস্বী ব্রহ্মচারী, যে তত্ত্বজ্ঞানে কাপেয় শৌনক বা কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন নয়, সে নিরন্ন, অন্নভিক্ষা করে; এবং অন্নবান ব্রহ্মজ্ঞরা তাকে বিমুখ করে, অন্ন দেয় না। পরে যখন কাপেয় শৌনক পরমাত্মার সংজ্ঞা নিরূপণ করেন এই বলে যে, তিনি সর্বভোজী তখন তাঁর খেয়াল হয় অন্নভোজিত্বের ওপরে এই যে মর্যাদা আরোপ করা হচ্ছে তার সঙ্গে অন্নপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার কোথাও যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। তখন সে অনুচরদের ব্রহ্মচারীকে অন্ন দিতে বলে। তা হলে এ সমাজে রৈক্ব'র মতো পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অপুষ্টিতে ভোগে, বিদ্বান ব্রহ্মচারী এমন দুজনের কাছে ভিক্ষা চায় যারা তাকে অন্ন দিতে সমর্থ, কিন্তু প্রথমেই তার অন্নভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে। এ সমাজে সকলে খেতে পায় না। গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তত্ত্বজ্ঞানীও অভুক্ত থাকে। কাজেই ব্যাপক একটা অভাবের কালো পর্দা সব কিছুর পশ্চাতে দোদুল্যমান ছিল। সারা সমাজে একটা কালো অন্নাভাবের আতঙ্ক— পরিব্যাপ্ত ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে ইন্দ্রিয়, বাক, চক্ষু, কর্ণ, মন এ সকলের উপরে প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে— প্রাণের অধীনে দেহের সব ইন্দ্রিয় কাজ করে। তার পরের খণ্ডে শুনি, প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পর প্রাণ প্রশ্ন করছে, 'আমার খাদ্য কী হবে?' উত্তরে ইন্দ্রিয়রা বলে, 'কুকুর ও শকুনি ইত্যাদি সর্ব জীবের যা কিছু অন্ন আছে।' যা কিছু খাওয়া হয় সবই 'অন'-এর অন্ন, 'অন' শব্দটি প্রাণের প্রত্যক্ষ (= সাক্ষাৎ) নাম। 'যে এ ভাবে জানে তার কাছে কোনও অন্নই অনন্ন হয় না— স হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি যৎ কিঞ্চিদাশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং না হ বা এবং বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি।' (৫:২:১) এখানে লক্ষণীয় 'অন' (= প্রাণ, প্র + অন)-এর খাদ্য কুকুর থেকে শকুনি পর্যন্ত সব কিছুই। বলাই বাহুল্য, কুকুর বা শকুনি কোনওটাই খাদ্যপদবাচ্য নয়, সহজ অবস্থায় মানুষ এগুলো খায় না। তবে কেন এ দুটো প্রাণীর উল্লেখ? লক্ষ করতে হবে, কোন প্রশ্নের উত্তরে এ কথা; প্রশ্ন করছে প্রাণ, বলছে 'আমার খাদ্য কী হবে।' অর্থাৎ প্রাণধারণের জন্যে মানুষ কী খাবে। উত্তরে স্বাভাবিক প্রচলিত খাদ্যের নাম না করে বলা হচ্ছে এমন দুটো প্রাণীর

মাংসের কথা যারা স্বভাবত জুগুপ্সা উৎপাদন করে। উদ্দেশ্য হল এই কথা বলা যে, প্রাণধারণের প্রশ্ন যখন তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করে, তখন আর বাছাবাছি চলে না; কুকুর-শকুনির মাংস খেয়েও প্রাণরক্ষা করতে হবে। চোখে পড়ে, প্রাণরক্ষার জন্যে শস্যের কথা বলা হচ্ছে না, মাংসের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, সময়টা শস্যের ঘাটতির সময়, খরা অজন্মা ইত্যাদিতে তখন দুর্ভিক্ষ, যখন দেশে ফসল নেই, তখন প্রাণরক্ষার জন্যে পথের কুকুর ধরে বা আকাশের শকুনি শিকার করেও বাঁচতে হবে। এ সব কথা থাকতই না যদি না দুর্ভিক্ষ একটা সুপরিচিত ঘটনা হত। মনে পড়ে আক্কাদীয় সাহিত্যে পড়ি 'গম পচা হলেও আমি তা খাই। বীয়ার— (আহ্) স্বর্গীয় জীবন! আমি পরিহার করতে বাধ্য হয়েছি। (দারিদ্রের) এ যাতনা নিদারুণ দীর্ঘ হয়েছে।'[৪]

বৈদিক সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ণনা বা বিবরণ নেই। যখন ভিক্ষা মেলে না তখন দুর্ভিক্ষ— এই অর্থেই দুর্ভিক্ষ বোঝা যায়। নানা কারণে দুর্ভিক্ষ হতে পারে; তার মধ্যে খরার অজন্মা একটি। এই খরাজনিত দুর্ভিক্ষ প্রাচীন মিশরে পর পর সাত বছর হয়। তার একটি বর্ণনা পাই— 'ফসল নেহাৎ কম, ফলগুলো সব শুকিয়ে গেছে, যা কিছু মানুষ খেত তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক মানুষ তার সহচরের (ঘরে) চুরি করছিল... শিশুরা আর্তনাদ করছে। যুবকরা প্রতীক্ষা করছে, বৃদ্ধদের হৃদয় বিষাদে ভরা, তাদের পা গুলো বেঁকে গেছে, মাটিতে দুবড়ে পড়েছে, তাদের হাতগুলো জোড় করা। দেশগুলো অভাবে আচ্ছন্ন, মন্দিরগুলো বন্ধ; মঠে দেউলে বাতাস (ছাড়া কিছুই নেই)। সব কিছুই ফাঁকা হয়ে গেছে।'[৫]

এমনই এক দুর্ভিক্ষের উপাখ্যান পাই ওই ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেই:

> 'কুরুদেশ'-এ যে বার শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়েছিল, তখন হাতির মাহুতদের গ্রামে, কিশোরী ভার্যার সঙ্গে বাস করতেন অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত উষস্তি চাক্রায়ণ। তিনি এক মাহুতকে নষ্ট-হয়ে-যাওয়া মাষকলাই খেতে দেখে ভিক্ষা চাইলেন। (সে লোকটি) বলল, 'এই-যে-কটা আমার পাত্রে ঢালা আছে তা ছাড়া আমার তো আর নেই।'
>
> 'ঐগুলো থেকেই আমাকে দাও' সে ওগুলি তাঁকে দিল, আর বলল, 'চাইলে এই যে জল আছে (তা-ও নিন)।'
>
> (তিনি) বললেন, 'তাহলে তো আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়ে যাবে।'

৪. 'Wheat even though putrid, I eat Beer– life divine I have eliminated from me Extremely long has been this distress ' Akkadian Observations on Life and World Order in *Ancient Near Eastern Texts* pp 21-23

৫. 'Grain was scant. fruits were dried up and everything which they eat was short. Every man robbed his companion.. . The infant was wailing. the youth was waiting. the heart of the old man was in sorow, their legs were bent. crouching on the ground, their arms were folded. 'The countries were in need. the temples were shut up; the sanctuaries, held (nothing but) air. Every(thing) was found empty'. 'The Tradition of the Seven Lean Years in Egypt' in *Ancient Near Eastern Texts* p. 31

(মাহুতটি) বলল, 'মাষকলাইগুলোও কি উচ্ছিষ্ট ছিল না?'

(উষস্তি) বললেন, 'ওগুলো না খেলে বাঁচতেই পারতাম না, পানীয় জল তো আমি যেখানে ইচ্ছা খেতে পারি।'

তিনি খেয়ে উদ্বৃত্তটুকু স্ত্রীর জন্যে নিয়ে এলেন। স্ত্রীটি আগেই ভাল ভিক্ষা পেয়েছিল, (তাই) ওইগুলো নিয়ে রেখে দিল। সকালে উঠে (উষস্তি চক্রায়ণ) বললেন, 'যদি খানিকটা খাদ্য পেতাম, কিছু ধন লাভ করতাম। ওই রাজা যজ্ঞ করবেন, তিনি আমাকে সমস্ত ঋত্বিকের কাজে বরণ করতেন।'

তাঁকে স্ত্রী বললে, 'স্বামিন্, তা যদি হয়, তবে (তোমার দেওয়া) সেই নষ্ট মাষকলাইগুলো রয়েছে।'

(উষস্তি) সেগুলো খেয়ে সেই আয়োজিত যজ্ঞে গেলেন।[৬]

উষস্তি চাক্রায়ণ যজ্ঞস্থলে গিয়ে দেখেন যে যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। সামবেদের গানের যে চারজন পুরোহিত উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য, এঁদের মধ্যে প্রথম তিন জনকে উষস্তি বললেন, 'তোমরা যাঁর স্তব করছ তাঁকে যথার্থ ভাবে না জেনে যদি স্তব কর তাহলে তোমাদের মাথা খসে পড়বে।' এই কথা শুনে যজমান (যিনি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন) উষস্তিকে বললেন, মহাশয়, আমি আপনার পরিচয় জানতে চাই। পরিচয় দিলে যজমান বললেন, 'আমি আপনারই খোঁজ করছিলাম আমার ঋত্বিক কর্মের জন্য; না পেয়ে এঁদের নিযুক্ত করেছি, এখন সমস্ত ঋত্বিক-কর্মের জন্য আপনাকেই বরণ করছি।' উষস্তি সম্মত হয়ে বললেন, 'আমার অনুমতি নিয়ে এঁরাই যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করুন, কিন্তু এঁদের যে পরিমাণ ধন দেবেন, আমাকেও ততটাই দেবেন।' যজমান বললেন, 'তাই হবে'। এর পর উষস্তি প্রস্তোতা, উদ্‌গাতা ও প্রতিহর্তাকে প্রশ্ন করলেন তাঁরা কোন কোন দেবতার স্তব করছেন। তাঁরা অজ্ঞতা নিবেদন করলে উষস্তি যথাক্রমে প্রস্তোতাকে বললেন, 'প্রাণই সেই দেবতা', উদগাতাকে বললেন 'আদিত্যই সেই দেবতা।' পরে প্রতিহর্তাকে বললেন, 'অন্নই (সেই দেবতা), সৃষ্টির সকল প্রাণী অন্নকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে জীবনধারণ করে। সেই অন্ন-দেবতাই প্রতিহারের দেবতা— অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি।' (ছা/উ; ১:১১:৯)

৬. মটচীহতেষু কুরুম্বাটিক্যা সং জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস। স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি। এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রাদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ। ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদয়ন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি। স হ খাদিতত্বাঽতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার। সাঽগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ। স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্‌বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাঽসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বরার্ত্বিজ্যেবৃণীতেতি। তং জায়োবাচ হন্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়। (ছান্দোগ্য উপ; ১:১০:১-৭)

এইখানে কাহিনির প্রথম অংশের সঙ্গে সংগতি খুঁজে পাওয়া যায়। অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ সে দিন সকালে স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'কিছু খেতে পেলে ওই যজ্ঞে পৌরোহিত্য পেতাম, কিছু ধনলাভ করতে পারতাম।' তিনি যজ্ঞস্থলে আসতেই পারতেন না চণ্ডালের এঁটো মাষকলাইয়ের বাসি উদ্বৃত্তটুকু না খেতে পেলে। অন্ন তার কদর্যতম চেহারায় এসেছিল উষস্তির সামনে, কিন্তু মর্মান্তিক যন্ত্রণায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রাণরক্ষার উপাদান হিসেবেই অন্নকে দেখতে হবে, জুগুপ্সাকে জয় করে হীনতম অন্নেও জীবনরক্ষা করতে হবে। মনে পড়ে, কুকুর বা শকুনির মাংসকেও প্রাণরক্ষার উপাদান হিসেবে শাস্ত্র সমর্থন করেছে। কাজেই এই উষস্তির দৃষ্টিতে যজ্ঞে প্রধান উপাস্য দেবতা যে হবে প্রাণ এবং তাকে টিকিয়ে রাখার প্রধান উপাদান যে হবে অন্ন তাতে আর আশ্চর্য কী। আদিত্য অর্থাৎ সূর্য জমিতে ফসল ফলাবার এক অপরিহার্য অধিদেবতা। তাই উষস্তির তত্ত্বসমাধানে দেবরাজ ইন্দ্র বা ব্রাহ্মণ্যের প্রতীক অগ্নি বা বৃহস্পতি, পরমাত্মা এঁদের স্থান নেই। জীবনের ভিত্তি প্রাণ, তাকে জীইয়ে রাখার জন্যে ফসল ফলানোর অধিদেবতা আদিত্য এবং জীবনরক্ষার একান্ত অপরিহার্য উপাদান অন্ন— এই তিনটিই প্রাধান্য পেল উষস্তির ব্যাখ্যানে। লক্ষ করি, উষস্তির এই উত্তরের সঙ্গে কোনও যুক্তি বা কারণ নির্দেশ নেই। কেন যে তিনি, প্রাণ, আদিত্য, ও অন্নকে প্রধান দেবতার স্থান দিলেন তার কোনও যুক্তি দিলেন না। ফতোয়ার মতো করেই বললেন, এবং আগের ঋত্বিকরা তা মেনেও নিলেন। অর্থাৎ উপনিষদ এই তত্ত্ব— অন্নের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা— করতে চায় এবং তা করছে উপবাসক্লিষ্ট কদর্য খাদ্য দিয়ে কোনও রকমে উদরপূর্তি করে যজ্ঞে এসেছে এমন এক ব্রাহ্মণের বাণী দিয়ে। ভূমিকায় দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত প্রকোপ চিত্রিত করবার পরে বুভুক্ষু ব্রাহ্মণের মুখে অন্নকে প্রধান দেবতা বলে চিহ্নিত করে উপনিষদই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

এখানে আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। যজমানের কাছে উষস্তির শর্ত ছিল অন্য পুরোহিতদের যত দক্ষিণা তিনি দেবেন উষস্তিকে ততটা অর্থাৎ তিনজনের মিলিত দক্ষিণার সমপরিমাণ ধন তাঁকে দিতে হবে, কারণ যজমান তাঁকে ওই তিন পুরোহিতদের স্থলে নিযুক্ত করেছেন। দক্ষিণায় খাদ্য, বস্ত্র, স্বর্ণ, পশু ও দাসদাসী দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু দক্ষিণার খাদ্য ত খেলেই ফুরিয়ে যাবে, হয়তো সংরক্ষণ করবার মতো কিছু শস্যও পাওয়া যেত, কিন্তু দরাদরির সময়ে শুনি ধনের কথা। তার মানে ওই মারাত্মক দুর্ভিক্ষের দিনেও বেশি দাম দিয়ে খাবার কেনা যেত, অর্থাৎ এখনকার ভাষায় খাদ্যের 'কালোবাজার' ছিল। তখন সেই ফসলের আকালের দিনেও যজমান যজ্ঞ করছেন, অর্থাৎ অন্তত সতেরো জন পুরোহিতকে রোজ দু'বেলা খাওয়াচ্ছেন এবং পুরোহিত ছাড়াও যজ্ঞে যে নানা রকম সাহায্যকারী দরকার হত, তাদেরও খাওয়াচ্ছেন। উষস্তির স্ত্রী ভিক্ষা পেয়েছিলেন, কাজেই ভিক্ষা দেওয়ার মতো উদ্বৃত্ত খাদ্য কোনও কোনও পরিবারে ছিল এবং টাকা বা ধনের বিনিময়ে ওই দুর্ভিক্ষের দিনেও কোনও কোনও মজুতদারের কাছে খাবার কেনা যেত। চিত্রটা ব্যাপক খাদ্যাভাবের, কিন্তু তারই মধ্যে দুর্নীতি ও কালোবাজারও চালু ছিল। আবার এমন সদাশয় অন্নবান ব্যক্তিও কদাচিৎ পাওয়া যেত যারা উষস্তির কিশোরী বধূটিকে খাবার ভিক্ষা দিতেন। এমন অজন্মা বা

দুর্ভিক্ষের সময়ে সাধারণ গরিব মানুষ, যারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তারা অনেকেই খাদ্যাভাবে মারা যেত বা অখাদ্য খেয়ে অসুখে পড়ত। কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত অন্নের অধিকারী মুষ্টিমেয় ধনীদের কাছেই 'অশনায়াপিপাসে', অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা, মৃত্যুর রূপ ধরে আসত না। বাকিরা দুর্ভিক্ষের দিনে কীটপতঙ্গের মতোই মারা যেত।

উষস্তি চাক্রায়ণের কাহিনির ঠিক পরেই ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপাখ্যান আছে তার নাম 'শৌব উদ্‌গীথ', অর্থাৎ 'কুকুরদের সামগান'।

> বক দালভ্য— দলভ্য ও মিত্রার ছেলে বক, ওরফে গ্লাব নামে এক ঋষি, বেদ অধ্যয়নের জন্যে গ্রাম থেকে নির্গত হলেন। তাঁর সামনে একটি সাদা কুকুর দেখা দিল। তার কাছে অন্য কুকুররা এসে বলল, 'মহাশয়, আপনি গান করে অন্নের সংস্থান করুন, আমরা ক্ষুধার্ত। সেই শাদা কুকুরটি তাদের বলল, 'কাল সকালে তোমরা এই জায়গাতেই আমার কাছে এস। পরদিন বক দালভ্য (মিত্রার পুত্র) গ্লাবও সেইখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। তখন (যজ্ঞে) বহিষ্পবমান স্তোত্র গানের সময়ে যেমন (সামবেদের স্তোতারা) পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে (যজ্ঞভূমিতে) পরিক্রমা করেন, সেই রকম কুকুরগুলি (পরস্পরের লেজ ধরে?) প্রদক্ষিণ করল। তার পর বসে পড়ে হিংকার উচ্চারণ করল। ওম খাব, ওম পান করব, ওম দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এখানে অন্ন আনুন, অন্নপতি! এখানে অন্ন আনুন।[৭]

এই উপাখ্যানটিতে কয়েকটি ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখা প্রয়োজন। শাদা কুকুর এক ধরনের আভিজাত্যের প্রতীক। ঋগ্বেদে প্রগার্যদের সম্বন্ধে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বারবার বলা হয়েছে তারা কৃষ্ণাঙ্গ; অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ আর্যরা উঁচু জাতের এমন ইঙ্গিত এতে আছে। এখানে ওই কুকুরটি পুরোহিতদের নেতৃস্থানীয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অন্য কুকুররা তার শরণাগত হয়ে বলে, 'আপনি গান করে আহার আনুন।' ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত; সামবেদের পুরোহিতরা যজ্ঞে গানই করে, সেই যজ্ঞের অন্তে খাদ্যলাভ ঘটে এমন বিশ্বাস এখানে উচ্চারিত। 'বহিষ্পবমান' স্তোত্র গাইবার সময়ে পুরোহিতরা ঝুঁকে নীচু হয়ে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করে, এবং পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকে। তার পর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে পুরোডাশ্ ও যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুমাংসের ভাগ পায় তারা। এ ছাড়াও যজ্ঞ যদি অভীষ্ট ফল দেয় তো সকলের জন্যেই খাদ্য সংস্থান হয়। বহিষ্পবমান স্তোত্রগানের অনুকরণ করার পরে কুকুররা যে হিংকারধ্বনি উচ্চারণ করে তা এখানে রূপান্তরিত হয়েছে অত্যন্ত শাদামাটা কথায়; বরুণ,

৭. অথাতঃ শৌব উদ্‌গীথস্তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্‌বব্রাজ। তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি। তান্ হোবাচেহৈব ম! প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার। তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ। ওমদামোং পিবামোং দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতাঽন্নমিহাহরদন্নপতেঽন্নসিহাহরাঽহরোঽমিতি। (ছন্দোগ্য উপ; ১:১২)

প্রজাপতি, সবিতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, 'আমরা খাব, পান করব, আমাদের জন্যে খাদ্য আনুন।' বরুণ এ যুগে জলের অধিদেবতা, অতএব পিপাসা দূর করার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা বোঝা যায়। প্রজাপতি ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকেই শস্যের, পশু ও মানুষের প্রজনিকা শক্তির অধিদেবতা, প্রজাকে পালন করতে শস্য ও পশুর যে কল্যাণ আবশ্যক, প্রজাপতি তার ব্যবস্থা করেন। আর ফসলের জন্যে, পশুর চারণভূমির উর্বরতার জন্যে যে সূর্যকিরণ প্রয়োজন সবিতা তার অধিদেবতা। সবিতা শব্দের অন্য অর্থ হল জন্মের অধিদেবতা ('সূ' ধাতুর অর্থ প্রসব বা জন্ম দেওয়া, সু + তৃচ = সবিতৃ → সবিতা)। কাজেই এই তিন দেবতার উদ্দেশ্যে খাদ্যপানীয়ের জন্যে প্রার্থনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কাহিনিটি এই প্রার্থনাতেই শেষ, কুকুররা প্রার্থনার ফল পেল কিনা তা বলা হয়নি। যেমন ব্রাহ্মণসাহিত্যে সোমযাগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের গান ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানই বর্ণিত আছে, যজ্ঞের ফললাভের কথা কিছু বলা নেই। এ উপনিষদ সামবেদের, এ বেদের পুরোহিতদের যজ্ঞে নির্দিষ্ট কর্ম হল গান গাওয়া। যজ্ঞ যদি খাদ্যসংস্থানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে উদগাতা ও তার সহকারীদের ভূমিকা হল গান দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা, 'বহিষ্পবমান' অনুষ্ঠানটির শেষে হিংকার উচ্চারণ করার কথা। এখানে সি-হিংকার স্পষ্ট খাদ্য-প্রার্থনা। 'আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, আমাদের ভোজন ও পানের ব্যবস্থা কর।' সেই অশনায়াপিপাসে; এবং এখানে যে-শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'অশনায়াম' তার সোজা মানে হল, 'খিদে পেয়েছে।' কুকুরদেরও খিদে পেলে তারা যজ্ঞ কর্মের নকল করে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে, কারণ তখনকার সমাজ খাদ্য সংস্থানের ওই একটি উপায়ই জানত।

উষস্তি চাক্রায়ণের কাহিনির ঠিক পরেই এই 'শৌব উদগীথ'— এ দুটি উপাখ্যানের পটভূমিকা একই: ব্যাপক খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের চিত্র। প্রথমটিতে উষস্তি চণ্ডালের এঁটো, নষ্ট মাষকলাই খেয়ে যজ্ঞ করে পুরোহিতদের তত্ত্বশিক্ষা দিয়েছিলেন: অন্নই প্রধান দেবতা। সামবেদের পুরোহিতরা যে গান করছেন যজ্ঞে, সে গানের উদ্দিষ্ট দেবতা অন্ন। উষস্তি নিজে যজমানের সঙ্গে দরাদরি করে তিনজন পুরোহিতের দক্ষিণা নিজে যাতে পান সেই ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই করে রেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই মর্মান্তিক বুভুক্ষার নিষ্ঠুর রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, তাই তার থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে বাজারে দুষ্প্রাপ্য যে-খাদ্য তা যাতে চড়া দামে হলেও কিনতে পারেন সে সম্বন্ধে যজমানের কাছ থেকে নিশ্চয়তার আশ্বাস লাভ করেছিলেন এবং যজ্ঞনিরত পুরোহিতদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। বক গ্লাব বেদাধ্যয়নের উদ্দেশে বেরিয়ে যজ্ঞের অভীষ্ট ফল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলেন কুকুরদের আচরিত অনুষ্ঠান দেখে। সমাজে খাদ্যাভাব কোন পর্যায়ে গেলে উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরদেরও খাদ্যাভাব ঘটে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই সমাজে তখন মাঝেমাঝেই ব্যাপক অন্নাভাব ঘটত, তাতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ বিত্তহীনরা অন্নকষ্টে পীড়িত হত; মুষ্টিমেয় কিছু ধনীই শুধু বাড়তি দামে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত। অন্নাভাবের চিত্রটি ব্যতিক্রমী নয়, বরং এটি-ই মোটামুটি সাধারণ চিত্র।

শ্রেণিবিভাজন ও বহমান ক্ষুধা

দেখা গেল, কর্মকাণ্ডের যুগে সংহিতাব্রাহ্মণে সকল দেবতার কাছে বিভিন্ন ভাষায় খাদ্যের জন্যে বহু প্রার্থনা আছে; পরিসংখ্যানগত ভাবে দেখলে অন্য কোনও কাম্য বস্তুর জন্যেই অত প্রার্থনা নেই। অতএব খাদ্যাভাব তখনকার সমাজের একটি স্থায়ী ও ব্যাপক অবস্থা। আবার জ্ঞানকাণ্ডে আরণ্যক উপনিষদের যুগেও অসংখ্য ভাবে সেই একই প্রার্থনা উচ্চারিত; কখনও তত্ত্বকথার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও সরাসরি উপদেশে, কখনও-বা উপাখ্যান বা কাহিনির মাধ্যমে। জ্ঞানকাণ্ডের যুগে অন্নের মহিমা এতবার এত বিচিত্র ভাবে ঘোষিত হওয়াতে কতকটা বিস্ময় আসে, এবং এর থেকে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয়: দেশে খাদ্যের অভাব ছিল। যে পুরোহিত যজ্ঞে গান গায়, সেই উদ্‌গাতার শাস্ত্র যে ছান্দোগ্য উপনিষদ, তাতে এত সংখ্যায় খাদ্যের জন্যে প্রার্থনা? সামগানে প্রীত হয়ে দেবতা খাদ্য দেবেন? কিন্তু উষস্তি চাক্রায়ণ বলেন সামগানের মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তব ও প্রার্থনা নিবেদিত হয় এবং যথার্থ বোদ্ধা সামগায়ক জানেন সেই উদ্দিষ্ট দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন অন্ন, যে-অন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব যজ্ঞের গান শুধু গানই নয়, দেবতাকে স্বরূপে বুঝে তাঁর উপাসনাই যথার্থ গায়কের কর্তব্য। স্বরূপে বুঝে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি সে প্রার্থনা পূরণ করেন, এমন বিশ্বাস ছিল। ছিল বলেই শাদা কুকুরটিকে অন্য কুকুররা বলে, 'আমরা ক্ষুধার্ত, তুমি সামগান গেয়ে আমাদের জন্যে খাদ্যসংস্থান কর।' এবং পরে যজ্ঞের অনুকারী যে বহিষ্পবমান স্তোত্র গাওয়ার অনুষ্ঠান কুকুররা মিলে করে, তারও পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ছিল ওই বিশ্বাস: যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠান, করলে গানের প্রার্থনা— অন্নভিক্ষা— দেবতাদের কাছে পৌঁছয়। খাদ্যের জন্যে আর্তি কত গভীর ও মর্মান্তিক হলে বুভুক্ষু কুকুরদের দিয়েও যজ্ঞের একটি অংশের অনুকরণ করা হয়, তাদের প্রার্থনা শুনেও দেবতারা তাদের খাদ্য দেবেন এই বিশ্বাসে। অতএব সাধারণ অতি পরিচিত যে ছবিটি থেকে যায় তা হল দেশে প্রায়-সার্বত্রিক এক অন্নাভাব। হয়তো কোনও কোনও অঞ্চলে কোনও কোনও যুগে খাদ্যের মোটামুটি সচ্ছলতা ছিল, কিন্তু সাধারণ ছবিটায় খাবারের অসংকুলান পরিষ্কার দেখা যায়।

'অন্ন' কথাটির অর্থ যা খাওয়া যায়, অর্থাৎ খাদ্য। কিন্তু অর্থ সংকোচনের নীতিতে অনেক আগেই অন্ন মানে 'ভাত' দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখনও শব্দটি ওই অর্থই বহন করে। 'কেউ কেউ ধানের ব্যাপক ব্যবহারকে জমির শস্যবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে, এবং এক জায়গায় বিপুলসংখ্যক লোকের সমাবেশকে সম্ভব করে তোলার সঙ্গে এক করে দেখেছেন।'[১]

ধানের চাষ নানা কারণে বেড়ে যায়; বিভিন্ন ধরনের ধান ছিল, তার মধ্যে অনেকগুলো বিভিন্ন ঋতুতে ফলত, চাষটাও সহজ ছিল এবং আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত সর্বত্রই ধানের চল ছিল। ধানকে 'ধন' মনে করা হত তাই 'ধন' থেকে এর প্রতিশব্দ 'ধান্য' ব্যুৎপন্ন হয়েছিল। ধান থেকে সরাসরি ভাত রাঁধাও সহজতম পাক প্রক্রিয়া, কাজেই ক্ষুধিত জনসাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তির একটা সহজ উপায় ছিল ধানচাষ, এবং তা খুব ব্যাপক হারেই হত। তবু ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের যে সমান্তরাল দূরত্ব সেটা রয়েই গেল। অভুক্তের পাত্রে প্রয়োজন মতো খাদ্য জোগানের কোনও পাকা ব্যবস্থাই হল না। রয়ে গেল অভাব, গরিব সারা বছরই অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকত; যে-বছর উদ্বৃত্ত ফসল ফলত তা গিয়ে জমা হত ধনীর ভাণ্ডারে বা তার পণ্যসম্ভারে।

বৈদিক যুগের প্রথম পর্বে যে-উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল তাতে কাঠের ফলা-যুক্ত লাঙল দিয়ে যে-চাষ হত তার গতি ছিল ধীর, অনেক সময় নিয়ে ও অনেক পরিশ্রমে সামান্য জমি চাষ হত, সেই অনুপাতে ফসলের পরিমাণও কম ছিল। তা ছাড়া ছিল 'ঈতি'র আতঙ্ক এবং খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, পঙ্গপাল, শস্যনাশক কীট, ইঁদুর, শস্যের ব্যাধি, সৈন্যদের আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে বোনা ফসল সব সময়ে খাবারে উঠতে পেত না। এ ছাড়াও যে-বছর ভাল ফসল হত তখনো সে-ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে যা ছিল, তা আর্যদের প্রথম পর্যায়ে ছিল না। 'মহেঞ্জোদারো, হরপ্পাতে ও লোঠালে আশ্চর্য উন্নত প্রণালীতে নির্মিত বিরাট আয়তনের শস্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। লোঠালের কাছে তৈরি শস্যভাণ্ডার, যেটা সম্ভবত আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, সেটা তো খুব মজবুত ভাবেই তৈরি ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের পূর্বে কখনওই এত বেশি পরিমাণে শস্য এমন ভাবে সংক্ষরণের ব্যবস্থা ছিল না।'[২]

এ হল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও লোঠালের কথা— সিন্ধুসভ্যতার যুগ, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের খবর। আর্যরা আসবার পর যাযাবরত্ব ত্যাগ করে

১. 'Some have identified the wide-spread use of rice as a mechanism to raise the carrying capacities and to allow the agglomeration of large concentrations of population in a single place.' Allchin, *The Archeology of Early Historic South Asia*, p. 66

২. 'Granaries or grain storage of surprising sophistication and size have been found at Mahenjodaro, Harapa and Lothal. (At Lothal) The vanished granary probably destroyed by fire .. Never in Indian history till recent times are grain stored on this scale.' K T Achaya, *Technology of food*, p 459

স্থিতিশীল কৃষিজীবী হয়ে যখন তারা আর্যাবর্তে বসবাস করতে শুরু করল তখনও তারা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় সিন্ধুসভ্যতার সার্বিক সুনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার শৃঙ্খলা অর্জন করে উঠতে পারেনি। লোহার ফলার লাঙলে অল্প পরিশ্রমে বেশি ফসল ফলাত, মাংস, দুধ ও দুধের তৈরি খাবার এবং ওই ফসলের থেকে রুটি ওইসব খেত। সুবৃষ্টি হলে ভাল ফসল হত, হয়তো তখন সাধারণ লোকেরও খাবার জুটত। কিন্তু স্থিতিশীল হয়ে গ্রামীণ সভ্যতায় যখন তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে তখন তাদের সমাজব্যবস্থা— অর্থাৎ কৌম (clan) ও গোষ্ঠী (tribe) ভেঙে বৃহৎ 'কুল' অর্থাৎ এক বাড়িতে কয়েক প্রজন্মের একত্র বসবাস চালু হয়েছে।

একই সঙ্গে অনেকগুলি কুল একত্রে একটি গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে। প্রাগার্য সভ্যতায় গ্রাম ছিল, শহরও ছিল। আগন্তুকরা এসে প্রথমটায় সে সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে তোলে। কয়েক শতক পরে স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজে বাস করতে শুরু করার পরে লাঙলের চাষের সময়ে গোষ্ঠী কৌম ভেঙে 'কুল' স্থাপিত হলে অনেকগুলি কুল গ্রামে বসবাস করতে থাকে। সচরাচর গ্রামগুলি স্বনির্ভর ছিল এবং আয়তনে বেশ বড় থাকায় ধীরে ধীরে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে গ্রামগুলিই একক বলে পরিগণিত হয়। 'লাঙলের চাষে খাদ্যের জোগান অনেক বেড়ে যায় এবং অনেক বেশি নিয়মিতও হয়ে যায়। এর অর্থ একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই নয়, কিন্তু (এমন এক জনগোষ্ঠী যারা) বৃহত্তর এককে (গ্রাম) বাস করতে লাগল।'[৩]

ততদিনে এই ধরনের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারই সমাজের একক হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছে। শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সব রকম অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপদের প্রতিকার করবার মতো সুসংগঠিত বা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল যখন কমে যেত, তেমন সব অজন্মার বছরে, বা কোনও দৈবদুর্বিপাকে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে, মানুষের ভাগ্যে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাপক অনাহারই ঘটত। হয়তো দু-চারটি ভাগ্যবান পরিবারের কোনও সঞ্চয় থাকলে সে দুর্বৎসরটা কোনও মতে অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু প্রত্নখননে মহেঞ্জোদারো হরপ্পা ও লোঠালের পরে বহু শতাব্দী পর্যন্ত পাথরের বা ইঁটের তৈরি কোনও রকম শস্যসংরক্ষণ ভাণ্ডার প্রত্নখননে পাওয়া যায়নি। প্রথমত, উৎপাদন ছিল স্বল্প, দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহুবার সেই স্বল্প উৎপাদনও বিনষ্ট হয়ে যেত। তৃতীয়ত, তেমন কোনও শক্তিমান, সুসংহত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ছিল না যা প্রজাসাধারণের জন্যে ফসলের দুর্বৎসর ঠেকাবার জন্য অগ্রিম চিন্তা করে কোনও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারত। আর্যরা পোড়া ইঁটের ব্যবহার শেখে অনেক পরে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক নাগাদ। পাথরের স্থাপত্য সে যুগে পাওয়া যায় না; কাঠের ভাণ্ডগৃহ পোকায়, জলে, আগুনে নষ্ট হয়ে যেত, কাজেই মজবুত কোনও শস্যভাণ্ডারের নজির নেই।

৩. 'Plough agriculture greatly increased the food supply and made it more regular This meant not only a far greater population but one that lived together in greater units ' Kosambi, *An Introduction to the Study of Ancient Indian History* p 114

ফলে অনেকটা 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থাই চলত, সংগ্রহ সঞ্চয়ের পরিকল্পনাও ছিল না, ব্যবস্থাও ছিল না। চতুর্থত, জল, কীট, বাতাসের আর্দ্রতা থেকে ফসলকে অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ রাসায়নিক জ্ঞান তখন ছিল না, ফলে নদীবহুল দেশে বর্ষার আর্দ্রতা ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসলকে বাঁচাবার উপযুক্ত প্রায়োগিক বিজ্ঞান একেবারেই ছিল না। তাই সঞ্চিত ফসলও দীর্ঘকাল ভাণ্ডারে থাকলে সম্পূর্ণ ভাবে খাবার অযোগ্য হয়ে উঠত। এর অর্থ প্রাকৃতিক যে কোনও দুর্যোগ মানেই দুর্ভিক্ষ, ব্যাপক অনাহার।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে লোহার লাঙলের ফলার ব্যবহারে স্বল্পতর পরিশ্রমে বহুলতর ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হল। যেহেতু সংরক্ষণের ব্যবস্থা তখনও অনুপস্থিত, তাই এই বাড়তি ফসলের দু-তিনটি গতি হত। প্রথমত, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে সমাজে শ্রেণিবিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই উপস্থিত, তাই কিছু ধনিক শ্রেণির লোকের ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি, পশুসম্পত্তি যেমন বেশি ছিল, তেমনই ফসলের বেশি অংশ তাদেরই হাতে আসত। ফলে শস্যের অসম বণ্টন অনিবার্য ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের ভাগ্যে সামান্যই জুটত, চাষি মজুর পেটভাতায় কাজ করত এবং দুর্বৎসরে তাতেও টান পড়ত। বেশি উৎপাদনে ধনী লাভবান হয়েছিল তিন ভাবে। প্রথমত, তাদের কখনও খাদ্যাভাবে ভুগতে হত না; দ্বিতীয়ত, উদ্বৃত্ত খাদ্যের কিছু অংশ দিয়ে তারা অভুক্ত মানুষদের, কারখানার মজুর বা বাড়ির দাসদাসী হিসেবে নিযুক্ত করে রাখতে পারত; আর তৃতীয়ত, উদ্বৃত্ত ফসল ও কারিগরির শিল্পবস্তু নিয়ে বাণিজ্য করতে পারত। অতএব লোহার ফলার লাঙলে যে বাড়তি ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল, তার ভাগ দরিদ্রসাধারণের মধ্যে এসে পৌঁছত না, তাই খাদ্যাভাব ব্যাপক ভাবেই থেকে গেল সমাজে।

খাদ্যাভাব কত আতঙ্কের হলে খাদ্যকে ব্রহ্ম বলতে হয়? ব্রহ্ম সাধারণ দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নন, ইনি পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নন, ক্লীবলিঙ্গ; অর্থাৎ দেব বা দেবী নয়, তাদের ঊর্ধ্বে একটি শক্তি। নানা দর্শনপ্রস্থানে তিনি নানা ভাবে স্রষ্টা, পালক ও সংহারকর্তা। অর্থাৎ ব্রহ্মের ঊর্ধ্বে কোনও শক্তি নেই, সমস্ত দেবমণ্ডলী ও বিশ্বচরাচর তাঁর সৃষ্ট ও তাঁর অধীন। এই শ্রেষ্ঠ সর্বশক্তিমান দিব্যপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তাকেই অন্নের সঙ্গে অভিন্ন বা একাত্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে বারেবারে, যেন অন্নের মর্যাদা ওই অতুলনীয় মহিমা পায়। কর্মকাণ্ডের যজ্ঞে অন্যান্য দেবদেবীদের কাছে যথাবিহিত স্তোত্র গান ও হব্য দিয়ে অন্ন প্রার্থনা করা হত, তখন 'বিরাজ' ছন্দকে অন্নস্বরূপ বলা হচ্ছিল; বিভিন্ন দেবদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছিল, 'তিনিই প্রকৃষ্ট অন্নদাতা।' স্বভাবতই মনে হয়, এ প্রক্রিয়াতেও ইষ্টলাভ হচ্ছিল না, ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য জুটছিল না। তার পর উন্নততর কৃৎকৌশলে চাষে যখন উৎপাদন বাড়ল তখনও মানুষ দেখছিল ফসল বেশি জন্মানোর কোনও সুবিধা তাদের পাতে পৌঁছচ্ছে না। যজ্ঞের দেবতারা যাদের অনুগ্রহ করছিলেন, তারা সংখ্যালঘু, নতুন প্রণালীর চাষেও তাদেরই লাভ হল, উৎপাদক জনসাধারণের বুভুক্ষা, অপুষ্টি, অনটন আগের মতোই রইল। এ বার, নতুন পর্যায়ে, অন্ন দেবতাদের ছাড়িয়ে উঠল, এ বার সে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে উঠল, 'যে অন্নকে ব্রহ্ম বলে

জানে, তার কখনও অন্নভাব হয় না।' বলা বাহুল্য, এ সব নির্দেশের মধ্যে সমাজের পক্ষে হিতকর একটি দিক আছে, তা হল মানুষ যেন অন্নকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, অপচয় না করে, যত্ন করে তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করে। এতে ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই লাভ; অন্ন যত্নে সুরক্ষিত হয়। তবে কিছু চক্ষুষ্মান্ মানুষ নিশ্চয়ই লক্ষ করছিল যে যজ্ঞে দেবতাদের কাছে যথেষ্ট আবেদন-নিবেদনেও যেমন খাদ্যে অন্বিষ্ট প্রাচুর্য মেলেনি, তেমনই এখন জ্ঞানকাণ্ডের যুগে অন্নকে ব্রহ্ম বলে মনে করাতেও সে প্রাচুর্য পাওয়া গেল না। এটা যে ঘটেছিল তার প্রমাণ যজ্ঞ-অবিশ্বাসী বেশ কিছু মানুষের যজ্ঞে অনীহা দেখা গেল। এদের মধ্যে যাঁরা বেশি বুদ্ধিমান বা যোগ্যতর তাঁরা বেদ ও যজ্ঞের বিরোধী কিছু ধর্মপ্রস্থান প্রবর্তন করলেন এবং যজ্ঞে বীতস্পৃহ আরও অনেক লোক তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এঁরা দেখলেন, যাঁরা বহু আড়ম্বরে, বহু পশু বধ করে, যজ্ঞ সম্পাদন করেন তাদের চেয়ে অরণ্যচারী এই সব অবৈদিক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে বেশি কষ্টে আছেন তা নয়। এ সব প্রস্থানের অধিকাংশই জ্ঞানকাণ্ডের সমকালীন, কাজেই সমাজে যাঁরা যজ্ঞ করে অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করছেন তাঁদের মধ্যে যারা ইতর সাধারণ অর্থাৎ যাদের জমি, পশু, ইত্যাদি সম্পত্তি নেই, যারা ক্ষেতে চাষি, কারখানায় মজুর তাদের ভাগে অন্ন কিছু বেশি পড়ছে না। অতএব অত হাঙ্গামা করে যজ্ঞ করেও যেমন তাদের ক্ষুধা মেটেনি, তেমনি অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞান করবার দুরূহ মননপ্রক্রিয়ার কসরৎ করতে পারলেও তাদের অন্নাভাব মিটল না। এ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ভিক্ষাজীবী, যেমন বৌদ্ধ ও জৈনরা। অন্যদেরও অনেকে ভিক্ষা ও অরণ্যে ফলমূল সংগ্রহ করে প্রাণ ধারণ করতেন। ভিক্ষার অন্নও অনিশ্চিত, খরা, অজন্মায় দুর্ভিক্ষে ভিক্ষা মিলত না। যজ্ঞ যারা করত তারাও যেমন পর্যাপ্ত অন্ন পেত না, যারা অন্নকে ব্রহ্ম জ্ঞান করতে চেষ্টা করত বা করতে পারত তাদেরও তেমনই অন্নসংস্থান অনিশ্চিতই ছিল।

ভিখারি, অন্তত প্রাচীনকালে, সব দেশেই ছিল। তবে এ দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই অন্নভিক্ষা নানা ধরনের শাস্ত্রের সমর্থন পেয়েছিল। আশ্রমধর্মে ব্রহ্মচারী পরান্নে পালিত এবং সে ভিক্ষা করে খেত, এবং ভিক্ষান্ন আচার্যের বাড়িতেও আনত। যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে, মানুষ ফলমূল সংগ্রহ বা ভিক্ষা করে। জৈন সন্ন্যাসীও ভিক্ষা করত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভিক্ষার কথা 'জাতক' ও অন্য সব বৌদ্ধ গ্রন্থে বহু বিস্তৃত কাহিনির মধ্যেও পাওয়া যায়। অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের কথা, বিশেষত বুদ্ধ বোধিলাভ করার পূর্বে যে সব সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের কথাও পাওয়া যায়। এঁরা ছিলেন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, অতএব এঁদের ভিক্ষান্নে এবং সংগৃহীত ফলমূলেই ক্ষুধানিবারণ করতে হত।

পরাশরের 'ভিক্ষুসূত্র' গ্রন্থ এবং অন্যান্য অনেক দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রস্থানেও ভিক্ষার নির্দেশ দেওয়া আছে। 'অগেহী' বা 'অনিকেত' মানুষ সমাজে এক ধরনের সম্মান পেতেন। এঁরা যেহেতু নিজের বাড়িতে রান্না করতেন না, তাই পরের বাড়িতে ভিক্ষা করেই দিনপাত করতেন। অনেক ধরনের পাপের প্রায়শ্চিত্তেও ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খাওয়ার বিধান ছিল কোনও কোনও ব্রতেও ভিক্ষা করার বিধান ছিল। কাজেই সমাজে গৃহীর পাশাপাশি ভিক্ষাজীবীর

জন্যেও একটা ব্যবস্থা ছিল। তীর্থযাত্রী ভিক্ষা করেই খেতেন, বহু তীর্থস্থানেও অন্নসত্র থাকত। কাজেই বহু ক্ষুধিত মানুষ ভিক্ষায় পাওয়া খাদ্যে জীবনধারণও করতেন। ভিক্ষা পাওয়ার জন্যে সমাজে বেশ কিছু গৃহীর প্রয়োজন ছিল, যাঁরা ভিক্ষা দেবেন। অর্থাৎ এই সব সংসারী লোকেদের— বৌদ্ধ সাহিত্যে যাঁদের প্রধানত 'গহপতি' (গৃহপতি = গৃহী) বলা হয়েছে— বাড়িতে রান্না হত, এবং সে রান্নাটা শুধু বাড়ির লোকজনদের পরিমাপে নয়, কিছু বাড়তিও থাকত। দৈবাৎ এসে-পড়া অতিথি বা বুভুক্ষু ভিখারিকে বা নিয়মিত ভিক্ষার্থী সন্ন্যাসীকে তারই থেকে ভিক্ষা দেওয়া হত। ভিক্ষা দেওয়া, বিশেষত অন্নদান, তাই বরাবর সব শাস্ত্রেই পুণ্য কাজ। অর্থাৎ রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন কখনওই ছিল না যাতে রাষ্ট্র থেকে ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণের দায় বহন করা হবে। তাই যার জমি নেই, যে ভাগচাষি সামান্য জমিতে মজুর খাটে, সে দুর্বৎসরে খাদ্য পেত না, বাধ্য হত ভিক্ষা করতে। তাই পেশাদার ভিক্ষুক ছাড়াও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজের শ্রম বিক্রি করেও খিদে মিটত না বহু তথাকথিত 'নিম্নবর্গের' মানুষের।

পণ্ডিত আই বি হর্নার বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলেন, '...এগুলির (এর) উদ্ভব একটু অদ্ভুত ধরনের— প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ভারতের মাটির থেকে পৃথক, জনগণের মানসিক গঠনের কাছে বিজাতীয়। ধর্ম সম্বন্ধে এদের বিশেষ অধিকার থাকলেও শুধু মহাবীর ও গৌতমের অনুগামীরাই নিজেদের ভিক্ষু সম্প্রদায়ে সংগঠিত করেছিল।'[৪]

ফরাসি পণ্ডিত লুই দুমঁ বলেছেন, গৃহী ও ভিক্ষুর মধ্যে সম্পর্কে গৃহীর দিক থেকে ভিক্ষু যেন ঈর্ষার পাত্র ছিল। শুধু যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এর হেতু ছিল তাই নয়, সমাজ সে উৎকর্ষ স্বীকার করল। সেই ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে, যাতে ভিক্ষুক উৎপাদন বা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন করবার দায় থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায়। বৈদিক যুগে এ অধিকার ছিল পুরোহিত ও আচার্যের, এ যুগের শেষার্ধে এ অধিকার ছিল রাজার এবং সৈন্যদের ও কিছু রাজকর্মচারীরও। ফলে যে মানুষগুলি কোনও না কোনও ভাবে পরিশ্রম করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করত, নিজেদের এবং ওই পরোপজীবী গোষ্ঠীরও, তারা বুদ্ধিজীবী, মোক্ষার্থী বা নির্বাণকামীর কাছে ক্রমে ক্রমে হীন বলে পরিগণিত হল। অন্যান্য কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভিক্ষান্নে দিনপাত করবার বিধান ছিল, কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এটি একটি সর্বত্র-আচরিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসে উৎপাদক কৃষিকর্ম নিষিদ্ধ ছিল, এমনকী নিজের জন্যে রান্না করাও তাদের শ্রমণদের পক্ষে (বারণ ছিল), শ্রম হিসেবে

৪. '...were strange growths, constitutionally alien to the soil of India and foreign to the mentality of peoples In spite of their genius for religion, only the followers of Mahavira and Gotama formed themselves into communities of alms people.' I B Horner *1930 Women Under Primitive Buddhism· Lay Women and Almswomen*. London p. xxiii

শ্রমের কোনও মূল্য ছিল না, এবং এই নিষেধের অর্থ হল খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্যে ব্যবহারিক জীবনে গৃহীর ওপরে শ্রমণের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা।'[৫]

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে যখন বহু বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যেই মাধুকরী, ভিক্ষাটন, অনিকেতত্ব এবং শ্রমণত্ব স্বীকৃতি পেল, তখন স্বভাবতই এই সব প্রস্থানের পূর্বশর্তই ছিল সমাজের বৃহত্তর অংশ গৃহী থাকবে, সব রকম সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীর জন্য অন্নদানকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করবে। তাই তখনকার সব প্রস্থানের ধর্মগ্রন্থেই সন্ন্যাসী সম্পর্কে একটা সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করার চেষ্টা আছে এবং ভিক্ষুকে অন্নভিক্ষা দেওয়াকে পুণ্য অর্জনের উপায় বলে স্বীকার করা হয়েছে। তা হলে গৃহীর ওপরে একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হল: পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান করা ছাড়াও ধর্মপ্রস্থানের নির্দেশে বা অন্য কোনও কারণে যারা নিজেরা উৎপাদনের কোনও কাজে লিপ্ত থাকবে না বলেই ভিক্ষার দ্বারা অন্নসংগ্রহ করবে তারা প্রার্থী হয়ে এলে তাদের অন্নদান করতে হত। ঋগ্বেদে যারা স্বার্থপরের মতো নিজের অন্ন নিজেরাই খায়, অন্নের ভাগ দেয় না তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদ সেই অর্থে নীতিনির্দেশক গ্রন্থ নয়; তাই তখন গৃহী ইচ্ছে করলে অন্নপ্রার্থীকে যে বিমুখ করতে পারত তার নানা নিদর্শন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখেছি। কিন্তু তার তিন চারশো বছর পরে ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী, পর্যটক, প্রায়শ্চিত্তকারী বা ব্রতধারীর জন্যে সমাজ একটা ভিন্ন ব্যবস্থা করল। তখন পাশাপাশি দুটি সম্প্রদায়— গৃহী ও ভিক্ষু— একই সঙ্গে সমাজে বিরাজ করছে। ধনীরা চিরদিনই ধনের বিজ্ঞাপন হিসেবে কিছু পরগাছার মতো আশ্রিত, নিষ্কর্মা মানুষকে অন্নদান করত আবার খেয়াল খুশি মতো প্রার্থীকে প্রত্যাখানও করত। কিন্তু ওই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শ্রমবিমুখ, উৎপাদনবিমুখ অংশ যখন আহারের জন্যে সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীর ওপরে নির্ভরশীল, তখন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়াকে পুণ্যকর্ম বলে প্রচার না করলে তারা খেতে পাবে না, বাঁচতে পারবে না। তাই ধর্মবোধের মধ্যেই ভিক্ষুকে অন্নদান অনুপ্রবিষ্ট হল। বৌদ্ধ গ্রন্থে, বিশেষ 'জাতক'গুলিতে এই মর্মে বহু কাহিনি আছে। রামায়ণ মহাভারত কিছু পরের সংকলন হলেও এগুলি রচনার সূত্রপাত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে এগুলিতেও দেখি ভিক্ষাদান পুণ্যকর্ম। কাজেই সমাজে একটা সংহত মূল্যবোধে ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী সম্মানের আসনে স্থান পেল এবং কতকটা অধিকার হিসেবেই পরান্নে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী হল।

এই সমাজে যখন উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম, অথবা বেশি হলেও তা বণিকের কাছে পণ্যরূপে সঞ্চিত হয়, যখন নানা আগন্তুক উৎপাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য বিনষ্ট

'. .Buddhist monasticism denied productive agricultural work to its members. work as suchg was not valued, and its negation meant the monks, complete material dependence on the laity for the provision of food, clothing and shelter ' S J Tambiah. "The Renouncers Individuality and Community" in *Way of life: king. Householder, Renouncer* (ed) T N Madan, Vikas, 1982, p 306

হয়, যখন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল জানা নেই, এ বিষয়ে অপরিহার্য রাসায়নিক বিদ্যাও আয়ত্ত নয়— এই সমাজে ক্ষুধার তুলনায় খাদ্য অপ্রতুল। সাধারণ মানুষ তা বোঝে এবং যজ্ঞে, প্রার্থনায়, কৃষিকর্মে নিরন্তর খাদ্যের প্রাচুর্যের সন্ধান করে ফেরে, কারণ ক্ষুধা ও খাদ্যের মধ্যে সমান্তরাল ব্যবধানটা রয়েই গেছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও এমন কোনও বিধান ছিল না যে উৎপন্ন শস্যের একটা অংশ মজুত রেখে অকালে, দুর্ভিক্ষে দুঃস্থ প্রজাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে। এটা অনেক শতক পরে ধীরে ধীরে আসে এবং কখনওই পুরোপুরি কার্যকরী হয়নি। ফলে এ দেশে বেদের সময় থেকেই খাদ্যাভাব ব্যাপক ভাবে বর্তমান ছিল, অর্থাৎ 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং', ইত্যাদি ইচ্ছাপূরক স্বপ্নের প্রকাশমাত্র। বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটিয়েছে, দেশে ফসল বেশি হলেও তার ভাগ পায়নি, কম হলে তো অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে, না হলে মৃত্যু এসেছে 'অশনায়াপিপাসে'র চেহারায়। সে দিন যজ্ঞে যে সব দেবতাকে মাথা খুঁড়ে মিনতি জানিয়ে ক্ষুধিত মানুষ বিফল হয়েছে তাদেরই উত্তরপুরুষরা আজ সরকারের পায়ে মাথা খুঁড়ে আবেদন-নিবেদন করে বিফল-মনোরথ হয়ে উপোস করছে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

অথর্ব বেদ সংহিতা
ঋগ্বেদ সংহিতা
তৈত্তিরীয় সংহিতা
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
গোপথ ব্রাহ্মণ
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
শতপথ ব্রাহ্মণ
ঐতরেয় উপনিষদ্
ছান্দোগ্য উপনিষদ্
মাণ্ডুক্য উপনিষদ্
মুণ্ডক উপনিষদ্

Allchin, R 1995 *The Archaeology of Early Historic South Asia* OUP
Bandyopadhyaya N C 1945 *Economic Life and Progress in Ancient India*, Calcutta
Basu, J 1969 *India of the Age of the Brahmanas*, Calcutta
Bose, A N 1961 *Social and Rural Economy of Northern India circa 600 B C -200 A D*, Calcutta
Buch, M A 1979 *Economic Life in Ancient India* (2 vols), Allahabad
Chattopadhyaya, D P 1986, 1991 *History of Science and Technology in Ancient India* (2 vols) Calcutta
Claessen N J M & Kirk, P S 1978, *Thear Early State*, The Hague
Earle, T 1991 *Chiefdoms Power Economy and Ideology*, CUP
Horner, I B 1930, *Women and Primitive Buddhism. Lay Women and Almswomen*, London
Iyenger P T S 1932, *Life in Ancient India* N Delhi
Khare R S 1976, *The Hindu Hearth and Home*, Carolina
Khare, R S 1976, *The Hindu System of Managing Foods*, Simla

Kosambi, D D 1956, *Introduction to the Study of Ancient Indian History*, Bombay.

Prakash, O 1961, *Food and Drink in Ancient India*, Delhi.

Rau, W 1957, *Staat und Gasellschaft in alter Indien nach dem Brahmanen Texten dargestallt*, Wiesbaden

Renfrew, A C & Shennan S (ed) 1982 *Ranking Resource and Exchange*, OUP

Sengupta, P 1950, *Everyday Life in Ancient India*, OUP

Sharma, R S 1980, *Indian Feudalism*, N Delhi

Sharma, R S 1983, *Material Culture and Civilization in Ancient India* OUP

Thakur, V K 1932 *Urbanization in Ancient India*, N Delhi

Wittfogel, K A 1957, *Oriental Despotism A Comperative Study of Total Power*, Yale Univ Press

Hesiod *Works and Days* Loeb edn

Pritchard J B *Ancient Near Eastern Texts*, Princeton Univ Press

Achaya K T "Technology of Food" in *Hist of Technology in India* (ed) A K Bag

Ganguli, R "Famine in Ancient India" *ABORI* 15, 1933-34

Gode, P K "Indian Dietetics Use of Fried Grants" *ANNORI* vol 29

Mahapatra, G "Meat and Drink in Indian Cultural Tradition" WSC Wien, SP (8), 1990

Pandeya, L P "Famines in Ancient India" *Quarterly of the India International Centre*, 12 (2) June, 1985

Russell, J C "The Population of Ancient India A Tentative Pattern" *J of Indian Hist*, 1973

Shendge, M "Floods and the Decline of the Indus Civilization" *ABORI*, 1990

Tambiah, S J "The Renouncers Individuality and Community" in T N Madan (ed) *Way of Life King Householder and Renouncer*, Vikas 1982